চাঁদমামা

এপ্রিল ১৯৭৩

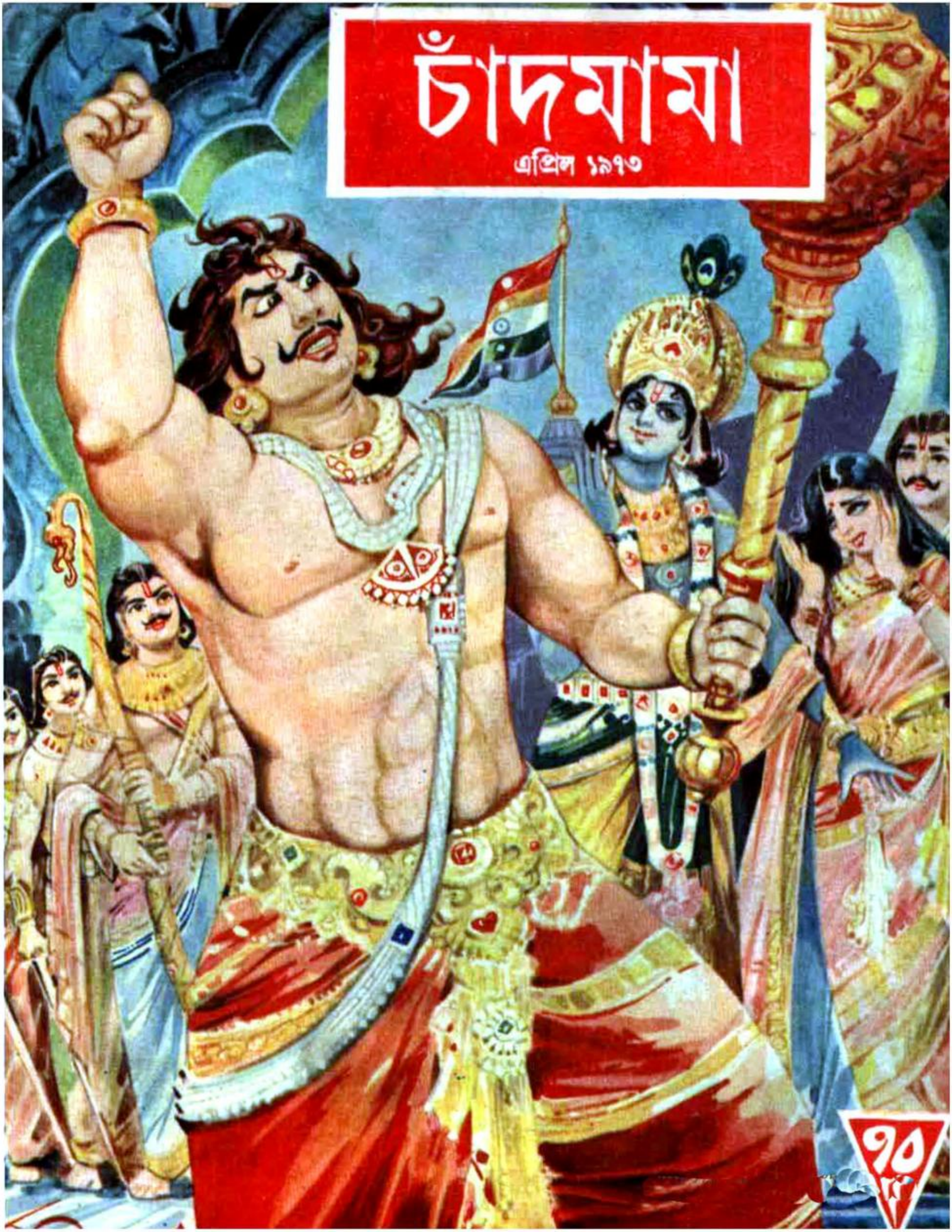

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন ও স্ক্যান করেছেন : ঝাড়গ্রাম ডেভিলস

এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

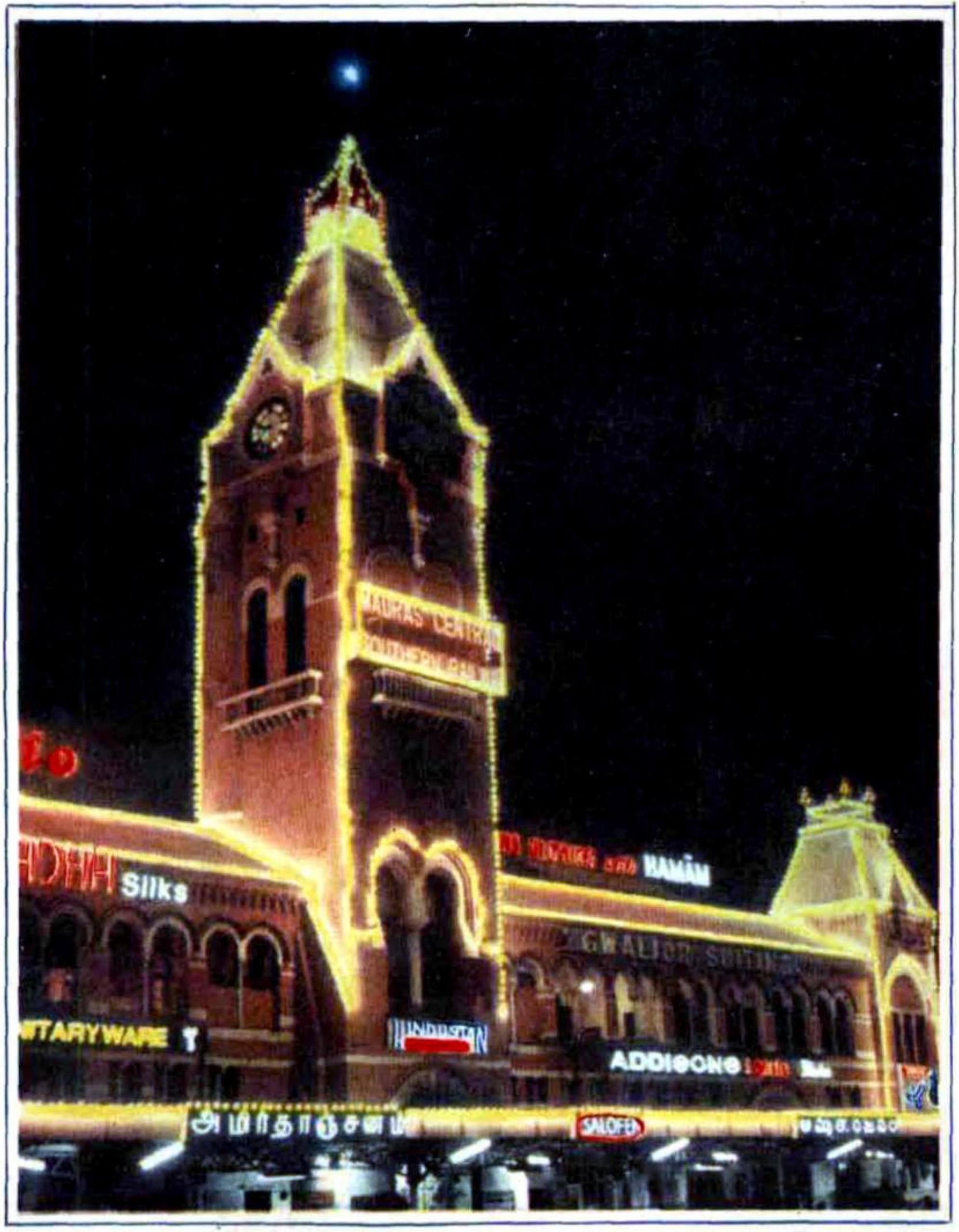

Photo by: PUSHPA

পেটের গোলমাল?
সে আবার কি বাপু?
কোনদিন শুনিনিতো!
ডাবর
গ্রাইপ
ওয়াটার
প্রত্যেক মায়ের কাছে
তার শিশুর মতন প্রিয়
শিশুদের বদহজম, অম্বল,
পেটব্যাথা, বায়ু, ও দাঁত উঠার
সময় ব্যাথার
একটি সুস্বাদু
সুনিশ্চিত
সমাধান
GRIPE
WATER
ডাবর (ডাঃ এস. কে. বর্ম্মন) প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

everest/551b/PP bh

চাঁদমামা

সংস্থাপক : বি. নাগি রেড্ডি
নিয়ন্ত্রণ : চক্রপাণি

এবারের বেতাল কথায় আছে 'পিতার ধর্ম'। প্রত্যেক মানুষের পালন করা উচিত পুত্র ও পিতার দায়িত্ব। এই দুটো দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু পরিবেশিত কাহিনীতে একটা বিরোধ দেখা দিয়েছে।

প্রাচীন কালে 'চুরি বিদ্যা'-কে চৌষট্টি কলার মধ্যে একটি কলা হিসেবে ধরা হত। কিন্তু এই বিদ্যার মর্যাদা আর রইল না। তবে বিদ্যা হিসেবে এ যে কঠিন বিদ্যা তাতে সন্দেহ নেই। এ ছাড়া আরও মজার কাহিনী আছে।

খণ্ড ১ এপ্রিল ১৯৭৩ সংখ্যা ১০

পুরস্কার

এক জমিদারের চারটি মেয়ে ছিল। বিয়ের বয়স হওয়ার পর একজন বাদে তিন জনের বিয়ে হয়ে গেল। সবার বিয়ে হল এমন পাত্রদের সাথে যারা ঘর জামাই থাকতে রাজী।

এবার চতুর্থ মেয়ের বিয়ের পালা। চতুর্থ মেয়ে কিন্তু ঐ বাড়ির চাকর রামের সাথেই বিয়ে করতে চায়। রাম বাচ্চা বয়স থেকেই ঐ জমিদার বাড়িতেই কাজ করছিল। তাই জমিদার মেয়ের ইচ্ছা পূরণ করতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের ছোট মেয়ের বিয়ে রামের সাথেই দিয়ে মেয়েকে বললেন, "মা আমি তোমার স্বামীকে এই বাড়িতে থাকতে দিতে পারি না। তুমি তাকে নিয়ে আলাদা ঘর করে থাক। রামের সাথে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, বিয়ে দিয়েছি। আমি চাই না তোমার একার জন্য তোমার বোনদের আর তাদের স্বামীদের লজ্জায় মাথা কাটা যাক।"

এ কথা কানে যেতেই রাম জমিদার বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তার জন্য জমিদার বাড়ির মেয়ে দাসী হোক এটা সে চাইছিল না। সে ভাবল যে তার বউকে সসম্মানে রাখবে। তার ব্যবস্থা করতে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হবে। যেদিন বউকে ভাল ভাবে রাখার মত ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে সেদিন সে ফিরে আসবে। নিজের ভাগ্যকে একবার যাচাই করে নিতে রাম বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

যেতে যেতে পরের দিন সকালে রাম এক বনে পৌঁছাল। বনের মাঝে একটা ময়দান ছিল। সেই ময়দানে একপাল গরু

রুদ্র প্রসাদ সেন

চরছিল। একটি গাছের নিচে এক বুড়ো খেতে বসেছিল। এমন সময় এক গর্ভবতী গাই ডাক ছাড়ল। বুড়ো ওখানেই খাবার ফেলে রেখে দৌড়ে গেল। গরুটির বাচ্চা হওয়া পর্যন্ত সে ঐ খানেই ছিল। খাবারের কাছে পৌঁছে গেল কাক আর কুকুর। রাম ঐ কাক আর কুকুর তাড়াচ্ছিল।

"বাবা আমার খাবার পাহারা দিয়ে খুব উপকার করেছ। তুমি না থাকলে খাবার কুকুর আর কাকের পেটে যেত। তুমি কে বাবা?" বৃদ্ধ প্রশ্ন করল।

"জীবিকার সন্ধানে বেরিয়েছি। আমার আপনজন কেউ নেই।" রাম জবাবে বলল।

বৃদ্ধ কিছু খাবার ওকে খেতে দিয়ে নিজের কাহিনী শোনাল।

ঐ বৃদ্ধের কাছে একশোটি গরু আছে। বৃদ্ধের কোন ছেলে মেয়ে নেই। গরু চরাতে আগে সে একটা চাকর রেখেছিল কিন্তু চাকরটা গরু বিক্রি করে টাকা মেরে দিল। অগত্যা বৃদ্ধ নিজেই গরু চরায়। বৃদ্ধের কাহিনী শুনে রাম বলল, "আপনি বুড়ো হয়েছেন। আমি আপনার সেবা করতে চাই। আপনার গরু চরাতে চাই। তার পরিবর্তে আপনার যা ইচ্ছে তাই আমাকে দেবেন।"

বৃদ্ধ রাজী হয়ে গেল। রাম গরুর দুধ দুইত। দুধ বিক্রি করে টাকা এনে বৃদ্ধকে দিত। গরু চরানো, জাব দেওয়া প্রভৃতি কাজ রাম একাই করত।

পনের দিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রামকে নানা ভাবে পরীক্ষা করে দেখল। বৃদ্ধ বুঝতে পারল যে রাম বিশ্বাসী লোক। তাই বৃদ্ধ রামকে বলল, "বাবা, ভাল মেয়ে দেখে আমি তোমার বিয়ে দিতে চাই।"

"হুজুর ক্ষমা করবেন, আমার বিয়ে হয়ে গেছে। টাকা পয়সা রোজগারের জন্য বেরিয়েছি।" রাম নিজের কাহিনী শোনাল।

বৃদ্ধ রামের কাহিনী শুনে বলল, "তাহলে তুমি এর চেয়ে ভাল কোন কাজের খোঁজ করছ না কেন? আমার কাছে কাজ করে তুমি কত আর রোজগার করতে পারবে?"

"হুজুর এর চেয়ে বেশী রোজগার করার মত কাজ করার ক্ষমতা কি আমার আছে? আমি কি পারব? ভাগ্যে যদি থাকে তো এতেই হয়ে যাবে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি এই ধরণের সাধারণ কাজই করে আসছি। এ ছাড়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনার রুটিই প্রথম খেয়েছি। আপনাকে খুশী করাই আমার প্রধান কর্তব্য।"

রামের কথা শুনে বৃদ্ধ চুপ করে বসে রইল। কিছুদিন পরে একদিন বৃদ্ধ রামকে বলল, "বাবা, গরুগুলোর জন্য একটা গোয়াল দরকার। যেখানে দাগ দিয়েছি আজ রাত্রে সেখানে গর্ত খুঁড়বে। বাকি কাজ কাল সারা যাবে।"

সেদিন রাত্রে বৃদ্ধের ঘুমানোর পর রাম গর্ত খুঁড়ল। দুটো গর্ত খুঁড়তে বলেছিল বৃদ্ধ। দুটোতেই রাম ধনভর্তি দুটো হাঁড়ি পেল। রাম গর্ত থেকে হাঁড়ি দুটো বের করে খুব সাবধানে ঘরে রাখল। আর সকাল হতেই রাম ঐ হাঁড়ি দুটো বৃদ্ধকে দিয়ে দিল। বৃদ্ধ হাঁড়ি দুটো দেখে বলল, "তুমি তো সৌভাগ্যের অপেক্ষায় ছিলে। এতদিনে তার সন্ধান পেলে। এই হাঁড়ি দুটো নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরে গেলেই পারতে। এতক্ষণ বসে আছ কেন?" আসলে বৃদ্ধ রামকে পরীক্ষা করার জন্য ঐ দুটো হাঁড়ি পুঁতে রেখেছিল।

"এতো আপনার সম্পত্তি। আমি কি করে নিতে পারি?" রাম বলল।

"সে কথা ঠিক নয় বাবা। তুমি আমার সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিস। তুমি এই ধন-সম্পত্তি নিয়ে গিয়ে যদি জমিদারের যোগ্য জামাই হতে পার তো নিয়ে যাও। আর তা না হলে তোমার বউকে এখানে নিয়ে এস। তুমিই আমার ছেলের মত থাকবে আমার কাছে। আর তোমার বউ থাকবে আমার বউমার মত।" বৃদ্ধ বুঝিয়ে বলল।

রাম জমিদারের বাড়ি গেল। বউকে নিয়ে বৃদ্ধের কাছে ফিরে এল।

ধনী-গরিব

এক গ্রামে দুই ভাই ছিল। বড় ভাই ছিল ধনী আর ছোট ভাই গরিব।

সে-বছর ক্ষেতে ফসল কাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ক্ষেতে পাহারা দেবার ভার ছিল ছোট ভাইয়ের উপর। তার মন মেজাজ খারাপ। এক কোণে বসে গালে হাত দিয়ে ছোট ভাই ভাবছিল। এমন সময় সাদা কাপড় পরে এক নারীকে ঘুরে বেড়াতে দেখল সে। ক্ষেতে এভাবে এক নারীর ঘোরাফেরা দেখে ছোট ভাইয়ের মনে কৌতূহল জাগল।

কাছে গিয়ে তার হাত ধরে ছোট ভাই প্রশ্ন করল, "বোন, তুমি কে ? কেন ঘুরছ ?"

"আমি তোমার বড় ভাইয়ের ভাগ্য-দেবী। যে সব খড়কুটো ছড়ানো আছে তা কুড়িয়ে পোড়াচ্ছি। কাজে লাগবে। ক্ষেতে ফসল ভাল হবে।" নারীমূর্তি জবাবে বলল।

"ভাই বুঝি ? আচ্ছা, আমার ভাগ্যদেবী কোথায় ?" ছোট ভাই বলল।

"ঐ সামনে যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে তার ওপারে যাও, দেখতে পাবে তোমার ভাগ্য-দেবীকে।" বলেই নারীমূর্তি অদৃশ্য হলেন। ছোট ভাই ঠিক করে ফেলল ভাগ্যদেবীর খোঁজে বেরিয়ে পড়বে। সোজা নিজের কুঁড়ে ঘরে গিয়ে সামান্য কিছু যা ছিল তা পোঁটলা বেঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ঠিক তখনই উনানের পিছন থেকে দারিদ্রদেবী উঠে 'হাউমাউ' স্বরে কাঁদতে লাগল। কিছুক্ষণ কেঁদে বলল, "আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। আর যেতেই যদি হয়, আমাকে সাথে নিয়ে যাও।"

বোহেমিয়ার লোককথা

ছোট ভাই অনেক বোঝাল। তাকে অনেক দূর যেতে হবে। অনেক পথ হাঁটতে হবে। সে তার সাথে অতটা পথ হাঁটতে পারবে না। কিন্তু দারিদ্র্যদেবী তাকে কোন ক্রমেই ছাড়তে রাজী হল না।

অবশেষে ছোট ভাই বলল, "ঠিক আছে, তোমাকেও সাথে নিচ্ছি। তুমি এই বোতলে ঢুকে পড়।"

দারিদ্র্যদেবী ছোট হয়ে ঐ বোতলে ঢুকে পড়ল। ছোট ভাই বোতলে জোরে ছিপি এঁটে দিল। বেরিয়ে পড়ল ওটা নিয়ে। পথে এক জায়গায় কাদা ভরে ছিল। সে ঐ বোতলটাকে কাদায় ঢুকিয়ে নিজের পথে হাঁটতে লাগল।

অনেক দিন হাঁটার পর ছোট ভাই দক্ষিণী পাহাড়ের ওপারে পৌঁছাল। ছোট্ট একটি শহর। সেই শহরের কয়েকজন ভদ্রলোক ছোট ভাইকে বলল, "আমাদের জন্য একটা ডোবা খুঁড়ে দিতে হবে। মজুরী দেব না। তবে খুঁড়তে খুঁড়তে যা পাবে তা তোমাকে দিয়ে দেব।"

এই শর্তে ছোট ভাই রাজী হয়ে গেল। কাজে হাত দিল। ঘণ্টা খানেক খুঁড়তেই সে অনেক সোনা পেল। ভদ্রলোকরা ছোট ভাইকে সমস্ত সোনা নিয়ে যেতে বলল। কিন্তু ছোট ভাই অর্দ্ধেক সোনা ওদের দিয়ে নিজে অর্দ্ধেক সোনা নিল।

সোনা পেয়ে ছোট ভাই কাজ থামিয়ে দেয় নি। কাজ করে যেতে লাগল। যত মাটি খোঁড়ে তত পায় সোনা মণি মুক্তো জহরৎ। আর পেল একটা বাক্স। সেই বাক্সের ভিতর থেকে আর্তনাদ শোনা গেল, "তাড়াতাড়ি বাক্স খোল।"

ছোট ভাই বাক্স খুলল। তার ভিতর থেকে এক নারী বেরিয়ে এল। পরনে তার সাদা কাপড়।

"কে তুমি?" ছোট ভাই সেই নারীকে প্রশ্ন করল।

"আমি তোমার ভাগ্যদেবী। তুমি তো আমারই খোঁজে বেরিয়েছ? আজ থেকে আমি তোমার বাড়িতেই থাকবো।

তোমাকে ছেড়ে যাব না।" একথা বলে ঐ নারী অদৃশ্য হলেন।

খোঁড়ার সময় যা পাওয়া গেল সব আধা আধি ভাগ হয়ে গেল। ভদ্রলোক পেল অর্দ্ধেক আর বাকি অর্দ্ধেক নিল ছোট ভাই।

ছোট ভাই ফিরল নিজের গ্রামে। নিজে যে অতীতে গরিব ছিল তা সে কোন দিন ভুললো না। গরিবদের যতটা পারল সাহায্য করল সারা জীবন।

একদিন পথে দুই ভাইয়ের মুখোমুখি দেখা। ছোট ভাই সাদরে বড় ভাইকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। কয়েক দিন খাইয়ে পরিয়ে অনেক কাপড় জামা ও দামী জিনিস উপহার দিয়ে বিদায় দিল। ঐ কদিন দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেক কথা হল। ছোট ভাইয়ের এত বিষয় সম্পত্তি দেখে বড় ভাইয়ের ঈর্ষা হল। মনে মনে ঠিক করল দারিদ্রদেবীকে আবার ছোট ভাইয়ের ঘরে এনে ছেড়ে দেবে।

সে ছোট ভাইয়ের কাছে শুনেছিল কোন জায়গার কাদায় দারিদ্রদেবীকে পুঁতে রাখা আছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে বড় ভাই ঐ বোতল পেল। ছিপি খুলে দিল সে। পরক্ষণেই বোতলের ভিতর থেকে দারিদ্র-দেবী বেরিয়ে বড় ভাইয়ের গলায় ঝুলে বলল, "তুমি আমাকে বাঁচালে। তোমার এই উপকারের কথা জীবনে ভুলব না। আমি সারা জীবন তোমার ঘরেই থাকব।"

বড় ভাই কত চেষ্টা করল ঐ দারিদ্র-দেবীকে আবার ঐ বোতলে পুরে রাখার। কিন্তু সে কোন ক্রমেই পারল না। ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে যা পেয়েছিল পথেই লুণ্ঠনকারীরা তার কাছ থেকে কেড়ে নিল। বাড়ি ফিরে সে দেখল, তার বাড়ি, ধানের গোলা প্রভৃতি সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। বন্যার জলে ভেসে গেছে তার ক্ষেতের ফসল। বড় ভাইয়ের নিজের বলতে আর কিছুই রইল না।

অমর বাণী

সিংহ শিশু রপি নিপততি মদমলিন কপোলভিত্তিষু গজেষু,
প্রকৃতি রিয়ম্ সত্ত্ববতাম্ ন খলু বয় স্তৈজসাম্ হেতুঃ। ॥ ১ ॥

[শাবক হওয়া সত্ত্বেও সিংহশাবক হাতীর কুম্ভস্থলে উঠে বসে। সত্যবানদের তভা আর বয়সের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকে না।]

রথস্যৈকম্ চক্রম্ ভুজগনমিতা স্সপ্তুরগা,
নিরালম্বো মার্গঃ চরণবিকল স্সারথিরপি,
রবি র্যাত্যে বান্তম্ প্রতিদিন মপারস্য, নভসঃ,
ক্রিয়াসিদ্ধি স্সত্ত্বে ভবতি মহতাম্ নোপকরণে। ॥ ২ ॥

[এক চাকার রথ, সর্পের বাগডোর, আধার বিহীন পথ, সারথী খোঁড়া হওয়া সত্ত্বেও আকাশে যাত্রা করেন। এই ভাবে সত্যবান মহাত্মাদের সাধনার কোন প্রয়োজন কি ?]

বিজেতব্যা লঙ্কা, চরণতরণীয়ো জলনিধিঃ,
বিপক্ষঃ পৌলস্ত্যো, রণভুবি সহায়াশ্চ কপয়ঃ,
পদাতি র্মর্ত্যোসৌ সকলমবধী দ্রাক্ষসকুলম্;
ক্রিয়াসিদ্ধি স্সত্ত্বে ভবতি মহতাম্ নোপকরণে। ॥ ৩ ॥

[জয় করতে হবে লঙ্কা। পায়ে হেঁটে সমুদ্র পেরোতে হবে। শত্রু হল রাবণ আর সাথী হল বানর। সে তো (রাম) মানুষ মাত্র। তা সত্ত্বেও সমস্ত রাক্ষসকে বধ করল। তাই, সত্যবান মহাত্মাদের পক্ষে সাধনার কি কোন প্রয়োজন আছে ?]

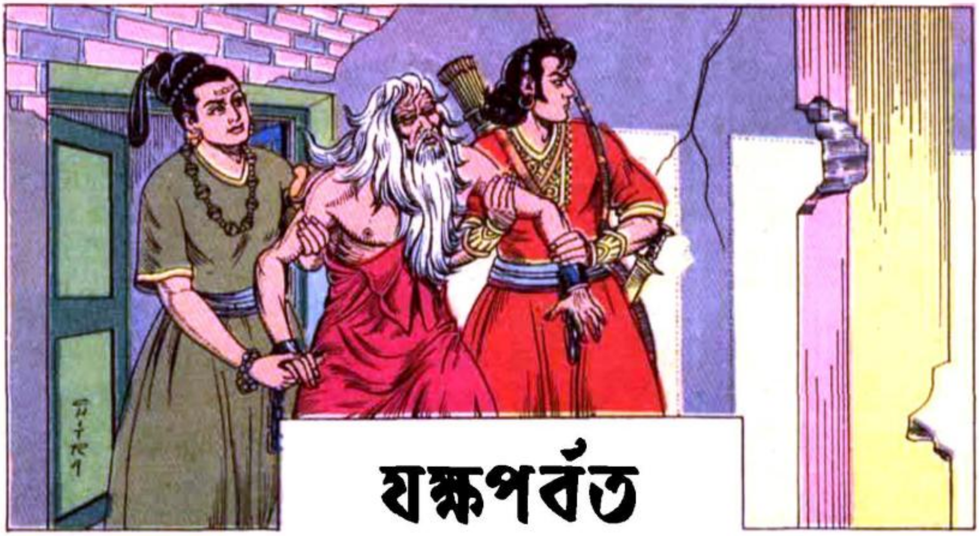

যক্ষপর্বত

নয়

[খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত সিংহকে অন্য এক ভবনে তাড়া করে ঢুকিয়ে দিল। নিজেরা চেষ্টা করতে লাগল ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ার। যাওয়ার পথে ওরা দেখতে পেল একটা ঘরে খাদ্যদ্রব্য তাকে তাকে সাজানো রয়েছে। দুজনে মিলে ঐ খাদ্যভাণ্ডারে আগুন লাগিয়ে দিল। আগুন লাগাতেই পাশের ঘর থেকে আর্তনাদ শোনা গেল। ঐ ঘরে ঢুকে ওরা দেখতে পেল এক বৃদ্ধকে। তারপর···]

খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে দেখতে পেয়েই বৃদ্ধ বলল, "কে তোমরা? ঐ পাজী পূজারিণীর শিষ্য বলে তো তোমাদের মনে হচ্ছে না! তোমরা যেই হও না কেন আমাকে বাঁচাও। পাশের ঘরের খাদ্য হয়ত পুড়ছে। তার আগুনের তাপে আমাকে যেখানে বেঁধে রেখেছে তা পুড়ে যাচ্ছে। আমার পিঠ জ্বালা করছে। পুড়ে যাচ্ছে আমার পিঠ। আমাকে খুলে দাও। আমি পুড়ে যাব।"

"কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘরের ছাদ ধ্বসে পড়বে।" বলতে বলতে জীবদত্ত বৃদ্ধের কাছে গেল। নিজের দণ্ডের আঘাতে বৃদ্ধকে বাঁধা শেকলগুলো ভেঙ্গে ফেলল।

বৃদ্ধের হাত ধরে তৎক্ষণাৎ তাকে টেনে বের করল ঘর থেকে।

বৃদ্ধ হতবাক হয়ে চারদিক তাকিয়ে বলল, "ও! কতদিন পরে আমি মুক্তি পেলাম। ঐ পাজী পূজারিণী কি এখনও এই শিথিল নগরে নিজের শাসন চালাচ্ছে। তোমরা কারা? এখানে এলে কেন? কি তোমাদের পরিচয়?"

"আমরা যেই হই না কেন তুমি যে পূজারিণীর কথা বলছ আমরা তার শিষ্য নই। বিন্ধ্যাচলে অনেক বড় একটা কাজ করতে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু পথে ছোটখাটো গোলমালে পড়ে এখানে কেমন করে যেন চলে এসেছি। আমাদেরও এখানে বন্দী করার চেষ্টা হয়েছিল। তোমার কথায় মনে হচ্ছে তুমি এখানকার আসল পূজারী। এখানকার পূজারিণী তোমাকে যে কোন ভাবে এই অন্ধকার ঘরে বেঁধে রেখেছে। ঠিক কথা বলছি না?" জীবদত্ত বলল।

"হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ। ঐ পাজী মেয়েটাকে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে আমি এই বনে কুড়িয়ে পেয়েছি। তখন সে বালিকা। কেমন যেন মায়া হল তার উপর। ওকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। আমার মন্ত্রতন্ত্র যা ছিল শেখালাম। কিন্তু ফল কি হল? এক ভয়ঙ্কর ঝড় বাদলের দিনে, কি ভয়ঙ্কর মারাত্মক রাত্রি, আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ছে, মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে আর তখনই ...।"

জীবদত্ত, বৃদ্ধ তান্ত্রিকের কথা শেষ হতে না হতেই বলল, "তোমার সমস্ত কথা শোনার সময় আমার নেই। আমরা পূজারিণীর খপ্পর থেকে বেরিয়ে বনে যেতে চাইছি। আমাদের ধরে বন্দী করতে এতক্ষণে পূজারিণী হয়ত সদলবলে বেরিয়ে পড়েছে। আমাদের তাড়াতাড়ি যেতে হবে। তুমি কি এখানেই থাকতে চাও না ভবন জ্বলে পুড়ে পড়ে যাওয়ার আগে আমাদের পথ দেখিয়ে আমাদের সাথে বেরিয়ে বনে যেতে চাও?"

“আমি ঐ পাজী পূজারিণীর অপরাধের বদলা না নিয়ে, তার হাড় না ভেঙ্গে এখান থেকে নড়ব না। আমার পুরানো শিষ্যরা এই অবস্থায় দেখলে ওরা চট করে আমার দিকে চলে আসবে। ওদের সাহায্যে আমি ঐ পাজী মেয়েটাকে মেরে টুকরো টুকরো করে চিল আর কাককে খাওয়াবো। যতক্ষণ না আমি তা করছি ততক্ষণ আমার শান্তি ফিরে আসবে না।” বৃদ্ধ তান্ত্রিক বলল।

এই কথা শুনে খড়্গবর্মা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল, “জীবদত্ত, আর দেরী নয়। এবার আমরা নিজেদের পথে যেতে পারি। পূজারিণী ও এই বৃদ্ধের মধ্যে যা হওয়ার হোক। এরা পরস্পরের মাথা কাটাকাটি করুক।” এ কথা বলে সে এগিয়ে গেল।

জীবদত্ত খড়্গবর্মার পেছনে যেতে যেতে বলল, “ঐ পাজী পূজারিণীকে ধরে টুকরো টুকরো করে তার মাংস কাক চিলকে খাওয়াতে চাইছ কেন? এই অঞ্চলে একটা ক্ষুধার্ত সিংহ ঘোরাঘুরি করছে। তাকে খেতে দাওনা কেন? তোমারও পুণ্য হবে আর তারও পেট ভরবে।”

বৃদ্ধ কি যেন বলতে যাচ্ছিল ঐ কথার জবাবে। কিন্তু ততক্ষণে পূজারিণী তার তান্ত্রিক, লোমশ-ভূত ও পাঁচ-ছজন শিষ্যকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেল। সেখানে বৃদ্ধ তান্ত্রিক, জীবদত্ত ও খড়্গবর্মাকে দেখে

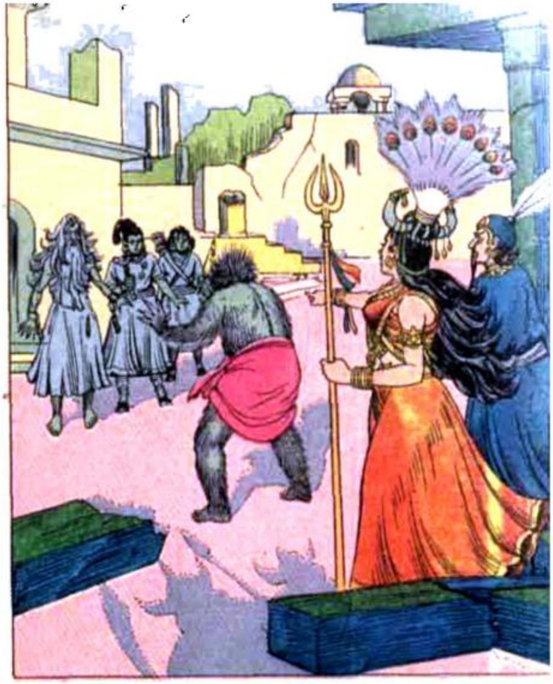

চোখ বড় বড় করে রক্তচক্ষু করে ত্রিশূল উঁচিয়ে গর্জে উঠলেন, “ও! এই বুড়োটা অন্ধকার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে! চোরা পথে চোরের মত আমাদের নগরে যে দুজন ঢুকেছে তারাও দেখছি এখানেই আছে! তোমাদের শেষ মুহূর্ত এসে গেছে! সবাইকে ধরে আমি মহাভূতের কাছে বলি দেব।” ঘোষণা করে সে এগিয়ে এল।

খড়্গবর্মা ঝট করে দুপা পিছিয়ে পূজারিণীর দিকে তীর তাক করে ধরে সাবধান করে দিয়ে বলল, “পূজারিণী আর এক পা এগিয়েছ কি আমার এই তেজ-তীর তোমার গলা এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব! সাবধান!”

দুজনকে বন্দী কর। ইতিমধ্যে আমি বুড়োটাকে দেখছি।"

এ কথা শুনে খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত হো হো করে হেসে উঠল। জীবদত্ত লোমশ-ভূতের দিকে এক পা এগিয়ে বলল, "ওরে ভূত, আমাদের ঠিক জানা নেই তোর আদৌ কোন ক্ষমতা আছে কিনা। পূজারিণীর আদেশ পালন না করে হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি ?"

লোমশ-ভূত কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে তান্ত্রিকের কাছে গিয়ে বলল, "গুরু এখন কি করব ? ওদের দুজনকে ধরে কাঁচা চিবিয়ে ফেলব ?"

"না শিষ্য তা করো না। অত বড় অপরাধ করা মহাপাপ হবে। পূজারিণী তাদের জ্যান্ত ধরে মহাভূতের কাছে বলি দিতে চান। আমাদের অত তাড়াতাড়ি কিছু করার নেই।" তার গুরু বলল।

এই সাবধান বাণী শুনে পূজারিণী পাথরের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তান্ত্রিক ও লোমশ-ভূত তার কাছ থেকে একটু সরে দাঁড়াল ; দু এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর পূজারিণীর এক শিষ্য নিজের শূল তুলে ধরে বলল, "মহাশক্তি পূজারিণী ! দেরী না করে এই বৃদ্ধ পূজারী আর এই দুজনকে মন্ত্রবলে ভস্ম করে ফেলুন !"

"না আমি এত সহজে এদের প্রাণনাশ করতে চাই না। এদের জ্যান্ত ধরে মহা-ভূতের কাছে বলি দিতে চাই।" তারপর পাশ ফিরে তান্ত্রিক ও লোমশ-ভূতের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে, তোমরা পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছ কেন ? ঐ যুবক

তান্ত্রিকের কথা শুনে পূজারিণী চোখ লাল করে শূল তুলে তার দিকে এগিয়ে যেতেই খড়্গবর্মা বলে উঠল, "পূজারিণী, তোমাকে একবার সাবধান করে দিয়েছি। এগোবে না। একটু নড়েছ কি তোমার গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে আমার তীর। পারতো ওখান থেকেই তোমার মন্ত্রশক্তি বলে তোমার শত্রুদের শেষ করে ফেল। আমাদের কোন আপত্তি নেই।"

এই সমস্ত ব্যাপার এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে বৃদ্ধ পূজারী উচ্চ কণ্ঠে বলল, "এখন ঐ গুরুদ্রোহিণীর কাছে কোন মন্ত্রশক্তি নেই। আমি আমার সমস্ত মন্ত্রগুলো ফিরিয়ে নিয়েছি।"

"ঐ বুড়োর একটি কথাও সত্য নয়। তোমরা ঐ হারামীর কথা বিশ্বাস করো না। শিষ্যগণ, আমি এক্ষুনি তাকে শূলে ফুঁড়ে তুলে ফেলছি।" বলতে বলতে পূজারিণী বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে গেল।

"থাম!" খড়্গবর্মা পূজারিণীর হাতে তীর ছুঁড়ল। "উফ্!" আর্তনাদ করে উঠল পূজারিণী। তার হাত থেকে শূল নিচে পড়ে গেল।

"পূজারিণী! তুমি আমার সাবধান বাণী ভুলে গেছ! তাই বাধ্য হয়ে তোমার উপর তীর ছুড়তে হল। আবার বলছি, সাবধান, এগিয়োনা আর!" খড়্গবর্মা দৃঢ়তার সঙ্গে বলল।

পূজারিণীর হাত থেকে শূল পড়ে যেতেই তার দুজন শিষ্য লাফিয়ে উঠে বলল, "মাটিতে ফেলে দিয়ে পূজারিণী অপবিত্র করেছে এই পবিত্র শূল। এবার থেকে আমাদের গুরু ঐ বৃদ্ধ পূজারী। বৃদ্ধ পূজারীর জয় হোক!"

"খড়্গবর্মা, আমরা আমাদের আসল কাজের কথা ভুলে যাচ্ছি। এই বোকা

হাবাদের এই শিথিল ভবনেই থাকতে দাও। এখানেই এদের থাকা ভাল। এরা বাইরে বেরুলে সাধারণ মানুষ এদের সাথে মিশে বোকা হয়ে যাবে।" জীবদত্ত বলল।

নিজের পক্ষে পূজারিণীর দুজন শিষ্য আসার ফলে বৃদ্ধ পূজারী খুশী হয়ে বলল, "হে মহাভূত! তুমি কতদিন পরে আমার শিষ্যদের অন্ধকার থেকে টেনে আনলে আলোয়। এবার থেকে, আগের চেয়ে অনেক বেশি জীবন তোমার কাছে আমি বলি দেব।"

"খড়্গবর্মা, এই পাজী বৃদ্ধ দেখছি পূজারিণীর চেয়ে কম বদমাইশ নয়।" এ কথা বলে জীবদত্ত মুখ ফেরাল সেখানে

সমবেত অন্যদের দিকে। তাদের সম্বোধন করে বলল, "তোমাদের ঝগড়ার মধ্যে আমরা কোন পক্ষ নিচ্ছি না। তোমাদের কেউ একজন আমাদের এখান থেকে বাইরে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দাও। আমরা বনে চলে যেতে চাই।"

"তোমরা এখান থেকে পালাতে চাও? তা হয় কখনও? দাঁড়াও, আমি তোমাদের দুজনকে শূলে গেঁথে মহাভূতের কাছে নিয়ে যাই। তবে তো···" বলতে বলতে পূজারিণী নিচে পড়ে থাকা শূল নিতে ঝুঁকল।

একটা তীর খেয়েও এই পূজারিণীর জ্ঞান হল না।" বলতে বলতে খড়্গবর্মা পূজারিণীর দিকে আবার তীর ছুঁড়তে উদ্যত হল। তক্ষুনি জীবদত্ত তার হাত চেপে ধরল।

"খড়্গবর্মা, এ যত পাজী-ই হোক না কেন মেয়েছেলেকে মারা উচিত হবে না। এই বৃদ্ধ আর পূজারিণী শিথিল ভবনে লড়ে মরুক, আমাদের কি। চল। আমরা চলে যাই।" এ কথা বলে জীবদত্ত মন্ত্রদণ্ড তুলে ধরে তান্ত্রিক ও লোমশ-ভূতের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দেবার স্বরে বলল, "তোমরা দুজনে বনের পথ ধর। কোই? উঁ, হুঁ। দেরি করো না।"

তান্ত্রিক বৃদ্ধ পূজারী ও পূজারিণীর দিকে ফিরে হাত জোড় করে তাদের বলল, "আমার গুরুজন, যে কোন কারণে গত চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আমার মন্ত্রশক্তিতে কোন কাজ হচ্ছে না। আমি এই দুজনকে পথ দেখাতে যাব না। আপনারা আমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করবেন।

বৃদ্ধ পূজারী ও পূজারিণী একে অন্যের দিকে তাকিয়ে নীরব ছিল। খড়্গবর্মা কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করে তান্ত্রিক ও লোমশ-ভূতকে ধমক দিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলল, "আজে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট না করে চল আমাদের পথ দেখিয়ে দাও।"

খাপ খোলা তরবারি দেখে তান্ত্রিক আর লোমশ-ভূত ভয়ে কেঁপে উঠল।

গুরু শিষ্য ওদের বলল, "হে মহা বীরগণ, আমাদের মেরো না! চল আমরা বনে যাওয়ার সুড়ঙ্গ পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।"

ঐ চারজনের চলে যাওয়ার পর বৃদ্ধ পূজারী ও পূজারিণীর দলের মধ্যে লড়াই বেঁধে গেল। জীবদত্ত ওদের দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "খড়্গবর্মা, এরা কেন লড়ছে জান তো? মহাভূতের পূজারী কে হবে সেটাই এরা লড়াই করে ঠিক করতে চায়। এই ঝগড়ায় জড়িয়ে এই ধোকাবাজ তান্ত্রিক আর তার শিষ্যও লড়ে মরতে চায়।"

"এই সব পাজীদের মরতে দাও। এই ক্ষুধার্ত সিংহ কয়েকদিন পেট পুরে খেয়ে বাঁচুক।" খড়্গবর্মা কথার পিঠে বলল।

এ কথা শুনে লোমশ-ভূত থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে তান্ত্রিককে বলল, "গুরু! ঐ খেতে-না-পাওয়া সিংহ পথে যদি কোন গুহায় লুকিয়ে থেকে থাকে! যদি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে কি হবে? গুরু, যাহোক ভেবে বল।"

"কি আর করবে যার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তাকে খেয়ে ফেলবে। বিশ্বাসঘাতক কোথাকার! চল। হুঁ।" খড়্গবর্মা তরবারি ঝন্‌ঝন্ শব্দ করে বলল।

"ওরে শিষ্য তুমি অত ভয় পেয়ো না। সিংহ সামনে পড়ে গেলে আমি তাকে

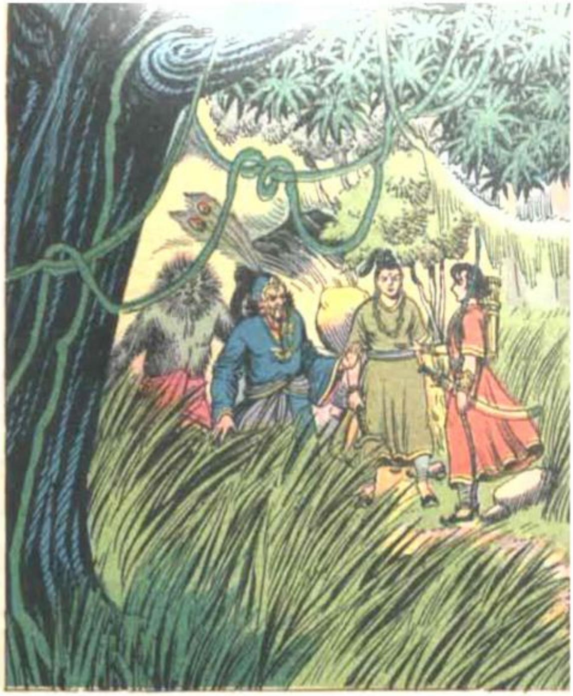

মুহূর্তের মধ্যে মন্ত্র দিয়ে বিড়াল করে ফেলব। চল আমরা গুহার সুড়ঙ্গ পর্যন্ত এসে গেছি। গুহায় প্রথমে তুমি ঢোক।" তান্ত্রিক বলল।

ঐ গুরু শিষ্যের পিছনে পিছনে সুরঙ্গ পথে এগোতে লাগল জীবদত্ত ও খড়্গবর্মা। ঐ খানেই ওরা আগের দিন রাত্রে শিথিল নগরে ঢুকে ছিল। ওরা শেষে বনে যাওয়ার গুহার মুখে পৌঁছাল। তারপর তারা গুহা পথে নাবতে নাবতে চারদিকে একবার তাকিয়ে লোমশ-ভূত ও তান্ত্রিককে বলল, "এবার তোমরা নিজেদের শিথিল নগরে ফিরে গিয়ে ভক্তি ভরে মহাভূতের পূজা কর।"

এ কথা শুনে তান্ত্রিক খড়্গবর্মা ও জীবদত্তকে নমস্কার করে বলল, "হে মহা-বীরগণ আমরা আর শিথিল নগরে ফিরে যাব না। ঐ দূরের পাহাড়ে গিয়ে কোন রকমে দিন কাটাব।"

"তবে মনে রেখ, আর কোন দিন লুঠপাঠ করো না। বিপদে পড়ে যাবে। সেখানে পৌঁছানোর আগে হঠাৎ গণ্ডক জাতের লোকের নজরে পড়ে গেলে ওরা তোমাদের আস্ত রাখবে না। ওরা ভীষণ চটে আছে তোমাদের উপর।" জীবদত্ত বুঝিয়ে বলল।

তান্ত্রিক ও লোমশ-ভৃত্য চলে যাওয়ার পর খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত নদীতে স্নান করল। কাছের বনে ঢুকে ফল পাড়ল। পেট ভর্তি খেয়ে গাছের নিচে এক ঘণ্টা বিশ্রাম করল। তারপর নদী তীরে গেল। তাদের মনে হল স্বর্ণাচারিকে যারা ধরে এনে ছিল তারা ঐ অঞ্চলেই কোথাও আছে। তখন ওরা ঠিক করল যে কোন ভাবে স্বর্ণাচারিকে উদ্ধার করব।

খড়্গবর্মা ও জীবদত্ত ঘণ্টাখানেক নদীর তীরে হাঁটতে লাগল। তীর ধরে হাঁটা পথে ওরা ছোট বড় অনেক পাহাড় দেখতে পেল। ওরা দেখল, বড় বড় পাথর উটের পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

"খড়্গবর্মা, এরা হয়ত ঐ লুণ্ঠনকারীদের দলের লোক। এরা হয়ত জানেনা যে সমতল ভূমি বা বালিতে যে উট চলে তাকে দিয়ে পাহাড়ের উপর পাথর চাপিয়ে টানানো অনুচিত। ফলে কত বড় বিপদ যে হতে পারে সে সম্পর্কে এদের কোন ধারণা নেই।" জীবদত্ত বলল।

জীবদত্তের মুখের কথা শেষ হতে না হতেই পাথর বোঝাই একটা উট গড়াতে গড়াতে মুখ থুবড়ে নিচে পড়ে গেল। তার পিঠে যে বসে ছিল সেও রেহাই পেল না। (আরও আছে)

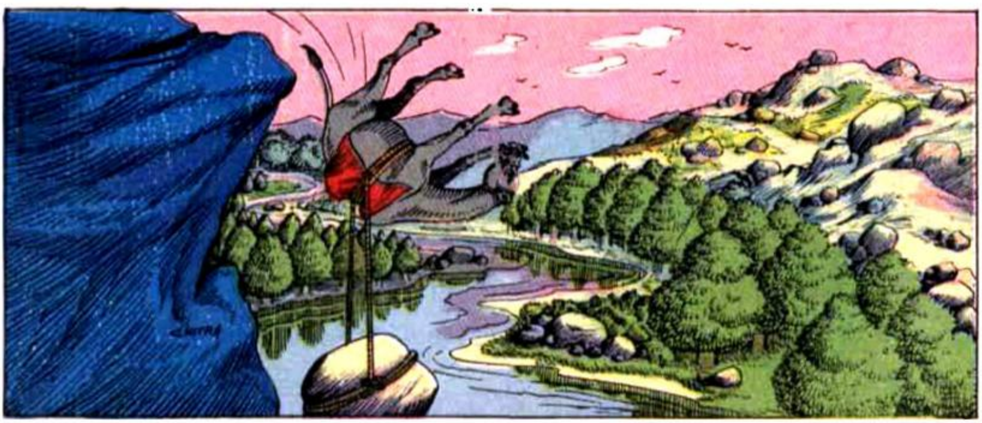

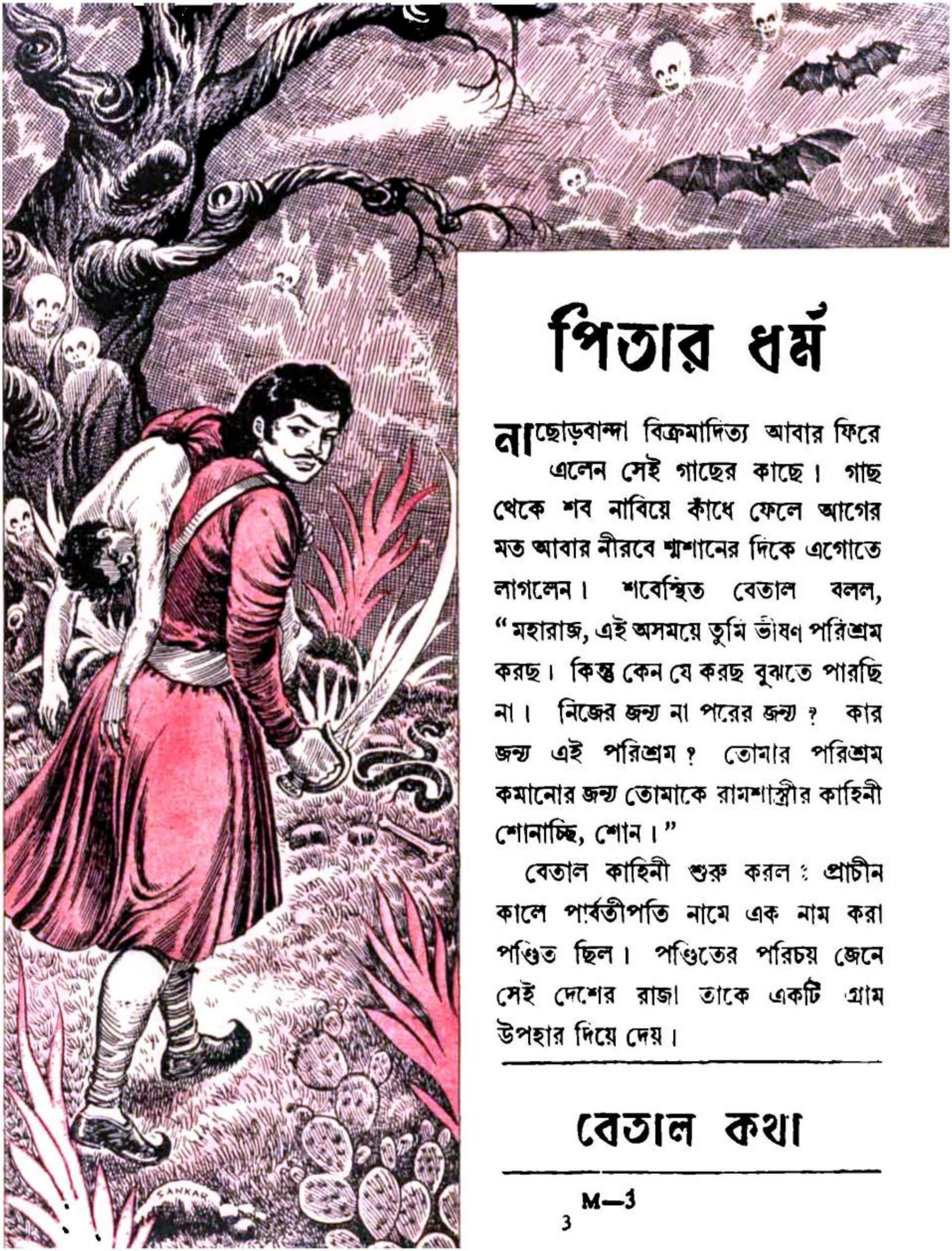

পিতার ধর্ম

নাছোড়বান্দা বিক্রমাদিত্য আবার ফিরে এলেন সেই গাছের কাছে। গাছ থেকে শব নাবিয়ে কাঁধে ফেলে আগের মত আবার নীরবে শ্মশানের দিকে এগোতে লাগলেন। শবেস্থিত বেতাল বলল, "মহারাজ, এই অসময়ে তুমি ভীষণ পরিশ্রম করছ। কিন্তু কেন যে করছ বুঝতে পারছি না। নিজের জন্য না পরের জন্য ? কার জন্য এই পরিশ্রম ? তোমার পরিশ্রম কমানোর জন্য তোমাকে রামশাস্ত্রীর কাহিনী শোনাচ্ছি, শোন।"

বেতাল কাহিনী শুরু করল ঃ প্রাচীন কালে পার্বতীপতি নামে এক নাম করা পণ্ডিত ছিল। পণ্ডিতের পরিচয় জেনে সেই দেশের রাজা তাকে একটি গ্রাম উপহার দিয়ে দেয়।

বেতাল কথা

পার্বতীপতির ধনসম্পত্তি অথবা খ্যাতির অভাব ছিল না। কিন্তু তার মনে শান্তি ছিল না। কারণ তার ছিল না কোন সন্তান। সেটাই তার দুঃখ। অনেক জপ তপ তীর্থ দর্শন প্রভৃতির ফলে তার একটি পুত্র সন্তান হল। ছেলের নাম রাখা হল রামশাস্ত্রী।

প্রত্যেক পিতাই চান তার পুত্র তার চেয়ে খ্যাতিমান হোক। পার্বতীপতিও চেয়েছিল তার ছেলে বিরাট পণ্ডিত হোক। তার চেয়ে বেশী যশ ও খ্যাতি পাক। কিন্তু তার আশা পূর্ণ হল না। কারণ রামশাস্ত্রীর একদম লেখাপড়ায় মন বসত না।

রামশাস্ত্রীর স্বভাব চরিত্র খুব ভাল ছিল। বাবা-মার প্রতি তার ভক্তি শ্রদ্ধাও ছিল। কিন্তু লেখাপড়ার নাম করলেই তার জ্বর আসত। যা শিখত পরক্ষণেই তা ভুলে যেত। কিছুই তার মাথায় ঢুকত না। তার মাথায় যেন গোবর ভরা ছিল।

পার্বতীপতির মনে নতুন এক দুঃখ দেখা দিল ছেলের এই অবস্থা দেখে। ছেলে যে পড়তে বসত না তা নয়। বসত। কিন্তু অনেকবার পড়লেও সে কিছুই মনে রাখতে পারত না। পড়ত আর ভুলত। দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল রামশাস্ত্রী।

একবার পার্বতীপতির এক ছেলেবেলার বন্ধু তার সাথে দেখা করতে এল। নাম তার চন্দ্রভট্ট। চন্দ্রভট্ট পাশের রাজ্যের দরবারের পণ্ডিত ছিল। চন্দ্রভট্ট যখন এল পার্বতীপতি তখন বাড়িতে ছিল না। রামশাস্ত্রী ছিল। তার সাথেই চন্দ্রভট্টের কথাবার্তা হল।

"তুমিই পার্বতীপতির ছেলে ?" চন্দ্রভট্ট প্রশ্ন করল। রামশাস্ত্রী দিল নিজের পরিচয়। বাবা কোথায় গেছে তাও জানাল। দুজনের মধ্যে অনেক কথা হল। এত কথা হওয়ায় চন্দ্রভট্ট বুঝতে পারল যে রামশাস্ত্রীর বুদ্ধিশুদ্ধির একেবারেই অভাব। ইতিমধ্যে পার্বতীপতি বাড়ি ফিরল। অনেকদিন পরে ছেলেবেলার বন্ধুকে দেখে পার্বতীপতির খুব আনন্দ হল। চন্দ্রভট্টকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস

করল। চন্দ্রভট্ট বলল, "পার্বতীপতি, আমার এখন আর কোন চিন্তাভাবনা নেই। এবার ছুটি নেব সব কাজ থেকে।"

"কেন? কি হয়েছে?" পার্বতীপতি প্রশ্ন করল।

"আমার চেয়ে যোগ্য পণ্ডিত যখন আছে। তখন আর ঐ পদ আঁকড়ে বসে থাকতে ইচ্ছা করে না।" চন্দ্রভট্ট জবাবে বলল।

"তোমার চেয়ে যোগ্য পণ্ডিত আবার কে আছে?" পার্বতীপতি প্রশ্ন করল।

"আর কে থাকবে আমার ছেলেই আছে।" সগর্বে চন্দ্রভট্ট বলল।

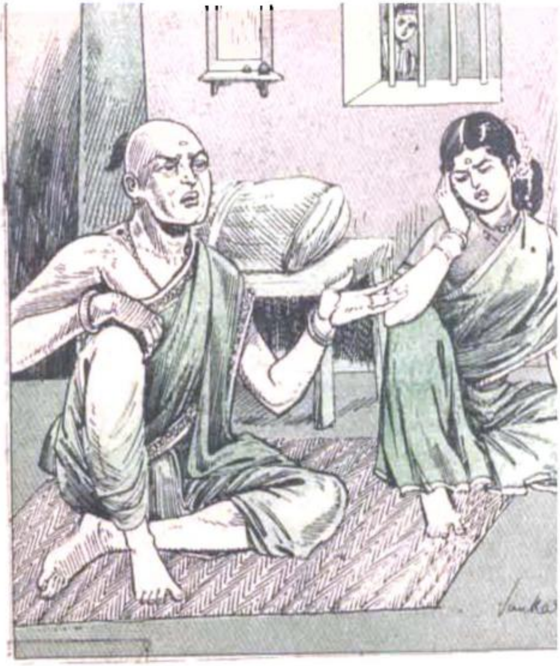

এই কথা শোনার পর সূক্ষ্ম অপমানের জ্বালায় পার্বতীপতি মাথা নীচু করে ফেলল।

চন্দ্রভট্ট আগেই জেনেছিল পার্বতীপতির ছেলের বিদ্যের দৌড়। পরক্ষণে সহানুভূতির সাথে চন্দ্রভট্ট বলল, "অনেক সাধ্যসাধনা করার পর ছেলে হয়েছে তো তাই আদর দিয়ে ছেলের মাথা খেয়েছ। এখন আর দুঃখ করে কি হবে।"

পার্বতীপতির মুখে কথা নেই। গম্ভীর ভাবে চুপ করে বসে রইল।

সেই দিন রাত্রে খেতে বসে পার্বতীপতি বউকে বলল, "এমন মূর্খ ছেলে জন্মানোর চেয়ে আমাদের কোন ছেলে না হলেই ভাল হত। ছি। এ রকম ছেলে থাকলে অপমানের বোঝাই বাড়ে। কোন দরকার ছিল না এ রকম অপগণ্ড, এ রকম মূর্খ ছেলের।"

রামশাস্ত্রী আড়ি পেতে মা-বাবার কথা শুনে বড় দুঃখ পেল। সেই রাত্রেই রামশাস্ত্রী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। প্রতিজ্ঞা করল যতদিন না পণ্ডিত হবে ততদিন সে বাড়ি ফিরে আসবে না।

বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেও কিছুতেই সে ভেবে পেল না কেমন করে পণ্ডিত হবে। শেষে ঠিক করল সরস্বতীর কৃপা প্রার্থনা করবে। তাঁর কাছে বর পেতে হলে তপস্যা করতে হবে। তাই, রামশাস্ত্রী তপস্যায় বসল।

অনেকদিন পরে রামশাস্ত্রীর তপস্যা সার্থক হল। সরস্বতী দর্শন দিয়ে বললেন, "বৎস, তুমি মহাপণ্ডিত হতে চাইছ? তুমি যদি এই রকম বোকা থাক তোমার ছেলে মহাপণ্ডিত হবে। আর তুমি যদি মহাপণ্ডিত হতে চাও তবে তোমার ছেলে হবে মূর্খ ও দুষ্ট। এই দুটোর মধ্যে তুমি কোন্ বর চাও?"

এই কথা শুনে রামশাস্ত্রী অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, "মা, আমি মহাপণ্ডিত হতে চাই মা।"

"তথাস্তু।" বলে সরস্বতী অদৃশ্য হলেন।

সরস্বতীর বর পেয়ে রামশাস্ত্রী সমস্ত বিদ্যায় পণ্ডিত হলেন। বাড়ি ফেরার পথে যত পণ্ডিতের সাথে তার দেখা হল প্রত্যেককে সে পাণ্ডিত্যে পরাজিত করল। মূর্খ ছেলে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে পণ্ডিত হয়ে ফেরাতে পার্বতীপতি খুশী হল। নিজের জীবন সার্থক হয়েছে মনে করল পার্বতী-পতি।

বাড়ি ফেরার কিছুদিনের মধ্যেই রাম-শাস্ত্রীর বিয়ে হল। দুবছর পরে রামশাস্ত্রীর একটা ছেলে হল। ছেলে যত বড় হতে লাগল সরস্বতীর কথা তত ফলতে লাগল। রামশাস্ত্রীর ছেলে যে গণ্ডমূর্খ ও দুষ্ট হবে তার লক্ষণ ফুটে উঠল। ছেলের জন্যে বার বার রামশাস্ত্রীকে অপমানিত হতে হত। তার বোকামী দুষ্টামির জন্য তাকে অনেক কথা শুনতে হত। ক্রমশঃ রামশাস্ত্রীর মনে নানা চিন্তা ভাবনা বাড়তে লাগল। সে ভাবল তার ছেলেকে কি করে পণ্ডিত করে তুলবে। কারণ তার ছেলের মূর্খ হওয়ার জন্য সেইতো দায়ী।

অনেক ভেবে রামশাস্ত্রী আবার সরস্বতীর তপস্যায় বসল। এবারের তপস্যার উদ্দেশ্য নিজে পণ্ডিত হওয়া নয়। ছেলে যাতে পণ্ডিত হয় তার জন্য বর প্রার্থনা করা। কিছুদিন পরে সরস্বতীর দর্শন পেয়ে বলল, "মা, আমার ছেলে কি এই রকমই থাকবে?"

"তুমি যদি তোমার পূণ্য কাজ ও পাণ্ডিত্য তোমার ছেলের জন্য ত্যাগ

করতে পার তাহলে তোমার ছেলে পণ্ডিত হয়ে উঠবে।" এ কথা বলে সরস্বতী অদৃশ্য হলেন।

রামশাস্ত্রী তাই করল। তার ছেলে এক মহা পণ্ডিত হয়ে গেল। যশ পেল। পেল খ্যাতি।

রামশাস্ত্রী মূর্খ ও দুষ্ট হয়ে উঠল। তার সুনাম ক্ষুন্ন হল। সবাই তার নিন্দা করতে লাগল।

বেতাল এই কাহিনী শুনিয়ে বলল, "মহারাজ, রামশাস্ত্রী স্বার্থপরের মত কাজ করল না ত্যাগীর মত? রামশাস্ত্রী নিজের ছেলেকে মহা পণ্ডিত হিসেবে দেখার জন্য আগে থেকে নিজে মূর্খ থাকলেই পারত। জেনে শুনে নিজে পণ্ডিত হল। ছেলেকে মূর্খ ও দুষ্টু করে রাখল কিছুদিন। তারপর সরস্বতীর কাছে বর চেয়ে নিজে মূর্খ হল আর ছেলেকে পণ্ডিত করল। এই ধরণের পরস্পর বিরোধী কাজ রামশাস্ত্রী করল কেন? আমার প্রশ্নের উত্তর জানা সত্বেও না দিলে তোমার মাথা ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

এই কথায় বিক্রমাদিত্য বললেন, "রাম-শাস্ত্রী নিজের পিতার প্রতি কর্তব্য পালন করল নিজে মহা পণ্ডিত হয়ে। আবার নিজের পুত্রের প্রতি কর্তব্য পালন করল নিজে মূর্খ হয়ে। এর জন্য তাকে যথেষ্ট নিন্দা ও অপযশের ভাগী হতে হয়ে ছিল। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে তার চরিত্রের মধ্যে এই পরস্পর বিরোধী গুণ ছিল। এই ভাবে রামশাস্ত্রী নিজের পুত্রধর্ম ও পিতৃধর্ম পালন করল। অর্থাৎ নিজের পিতার প্রতি এবং পুত্রের প্রতি নিজের কর্তব্য পালন করল। এতে পরস্পর বিরোধীতা নেই।"

বিক্রমাদিত্যের মুখ খোলার সাথে সাথে বেতাল শবসহ উধাও হয়ে আবার সেই গাছে গিয়ে উঠল। (কল্পিত)

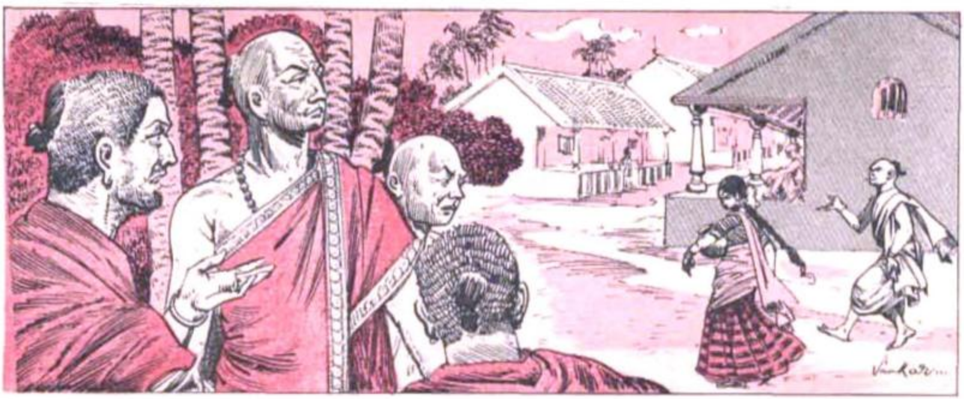

মোষের সিং

পরমানন্দ গুরু নিজের দুজন শিষ্যকে নিয়ে দেশ ভ্রমনে বেরিয়ে পড়লেন। পথে এক বনে তাঁরা থামলেন। পরমানন্দ গুরু রান্না করবেন ঠিক করলেন। এক শিষ্যকে গ্রামে পাঠালেন দুধ আনতে।

শিষ্য এক কিষণের বাড়ি গেল। এক বুড়িকে দেখে শিষ্য দুধ চাইল। বুড়ি দিতে রাজী হলো। ইতিমধ্যে শিষ্যের চোখ পড়ল এক মোষের উপর। শিষ্য ঐ বুড়িকে বলল, "ও বুড়িমা, এই মোষের সিং এত লম্বা, দরজাটা এত ছোট। মোষটা মরে গেলে এই গোয়াল থেকে বের করবেন কি করে?"

বুড়ি গাল পেড়ে শিষ্যকে ফেরত পাঠিয়ে দিল।

শিষ্য তাড়াতাড়ি ফিরছে না দেখে পরমানন্দ গুরু নিজের দ্বিতীয় শিষ্যকে পাঠাল। দ্বিতীয় শিষ্যও ঐ বুড়ির কাছে গিয়ে দুধ চাইল। বুড়ি প্রথম শিষ্যের কথাগুলো দ্বিতীয় শিষ্যকে বলল। দ্বিতীয় শিষ্য বলল, "ওর কোন জ্ঞান বুদ্ধি নেই। মোষ মরে গেলে সিং কেটে সোজা মোষকে টেনে বের করে ফেলে দেবে। মরা মোষকে গোয়ালে ফেলে রাখবে নাকি।"

তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় শিষ্যকেও গাল পেড়ে বুড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিল।

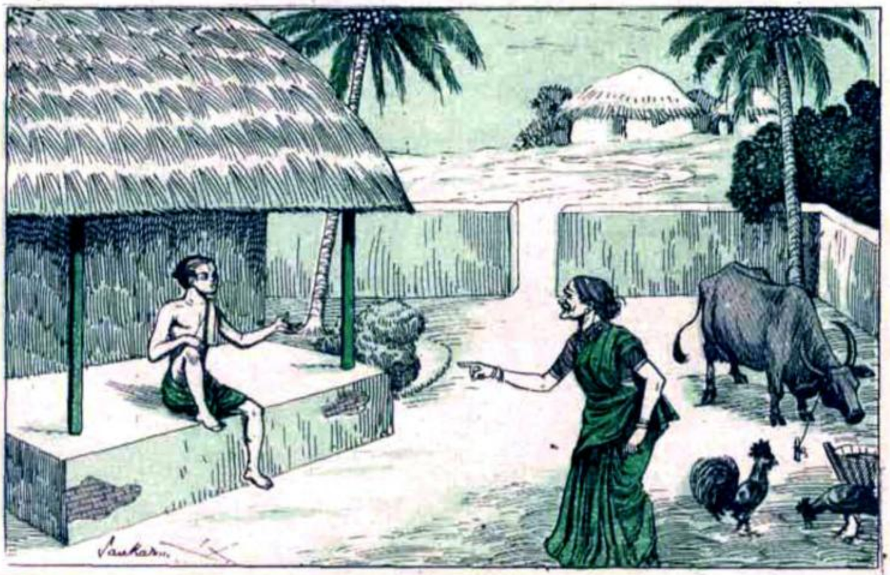

পৈতার ওজন

এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। লেখা পড়া জানত না। কিন্তু টাকা পয়সা রোজগারের ইচ্ছা তার ছিল প্রবল।

একদিন সেই ব্রাহ্মণ অন্য এক গ্রামে গেল। গ্রামের মণ্ডপে এক বুড়ো বসে পৈতা বিক্রি করছিল। একটি পাল্লায় তামার পয়সা, রুপোর মুদ্রা দিয়ে পৈতা নিয়ে নিত। ওজনের সাথে পৈতা কেনা বেচার কোন সম্পর্ক ছিল না।

এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করে গ্রামের ঐ ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে গেল। অনেকক্ষণ দেখে বুড়োর কাছে গিয়ে বলল, "মশাই, আমি খুব গরিব, আমাকে একটা পৈতা দান করবেন ?"

বুড়ো গরিব ব্রাহ্মণকে একটা পৈতা দিল। ব্রাহ্মণ ঐ দেশের রাজার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, আমার কাছে এক অমূল্য পৈতা আছে। আপনি এই পৈতা নিয়ে এর সমান ওজন সোনা পাইয়ে দিন।"

রাজা ব্রাহ্মণের কথায় রাজী হলেন। মন্ত্রী একটা দাঁড়ি পাল্লা আনালেন। একটা পাল্লায় পৈতা রেখে অন্য পাল্লায় সোনা রাখলেন। কিন্তু পৈতার ওজন বেশী ছিল। মন্ত্রী পাল্লায় আরও একটু সোনা রাখলেন। তাতেও পৈতার দিকের পাল্লাই ভারি ছিল। মন্ত্রী একটু একটু করে সোনা বাড়াতে লাগলেন কিন্তু পৈতার ওজন তখনও ভারি ছিল।

ফলে রাজা ও মন্ত্রী একে অন্যের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ইতিমধ্যে মন্ত্রীর মাথায় একটা মতলব এল। মন্ত্রী ব্রাহ্মণকে বললেন, "এখন

দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়

খাবার সময় হয়ে গেছে। খেয়ে এসে আমরা তোমার পৈতার ওজনের সমান সোনা দেব।"

মন্ত্রী চাল আনালেন। পৈতার সমান ওজনে চাল ওজন করিয়ে খেতে দিল। সেই চাল ছিল মাত্র এক পোয়া ওজনের সমান। রান্না করিয়ে ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো হল। ব্রাহ্মণের পেট ভরে গেল।

তারপর মন্ত্রী রাজাকে গোপনে বললেন, "মহারাজ, আমি যা ভেবেছিলাম তাই হল। এই পৈতার ওজন ব্রাহ্মণের নিজের আকাঙ্খার উপর নির্ভরশীল। সেই জন্যই এক পো চালেই পৈতার সমান ওজন হয়ে গেছে। ঐ পরিমাণ সোনায় ব্রাহ্মণের আকাঙ্খা মিটবে না?"

"তাহলে এখন কি করা যায়? আমি তো তাকে কথা দিয়েছি তার পৈতার ওজনের সমান সোনা দেব বলে।" রাজা বললেন।

"আপনি এই কাজের ভার আমার উপর ছেড়ে দিন।" মন্ত্রী বললেন।

ব্রাহ্মণ খাওয়ার পর মাত্র কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ফিরে এসে বলল, "পৈতার সমান ওজনের সোনা দিয়ে বিদায় করে দিন।"

"আমি তোমাকে সোনা দিতে পারি। কিন্তু তুমি তো সেই সোনা বয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে পারবে না। পথে খোওয়া যাবে। চোর ডাকাতের হাত থেকে অত সোনা বাঁচিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া তোমার কর্ম নয়। তুমি তো দেখলে তোমার পৈতার ওজন এক পো চালের সমান। তুমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক দিন রাজার বাড়িতে এসে একপো চালের ভাত খেয়ে যেতে পার। এখন তুমি ভেবে বল, কি চাও? সোনা নেবে না রোজ খেয়ে যাবে?" মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন।

ব্রাহ্মণ ভাবল তার পৈতার ওজন এক পো সোনার সমান হবে। সে বলল, "আমি প্রত্যেক দিন রাজার বাড়িতে খেয়ে যাব।"

বুদ্ধি

এক রাজার একটি মাত্র মেয়ে ছিল। রাজার মেয়ে খুব কথা বলতে পারত। তাই রাজা ঘোষণা করলেন, যে যুবক নিজের উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে রাজকুমারীর মুখ বন্ধ করে দিতে পারবে তার সাথে রাজকুমারীর বিয়ে হবে এবং অর্দ্ধেক রাজত্বও তাকে দেওয়া হবে। অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকুমারীকে পাবার আশায় বহু দেশের যুবক এসেছিল। কিন্তু প্রত্যেকে রাজকুমারীর প্রশ্নের জবাব দিতে না পেরে ফিরে গেল।

শেষে রাজা বিরক্ত হয়ে একটা শর্ত ঘোষণা করে দিলেন, যে যুবক ব্যর্থ হবে তার কান গরম শলাকা দিয়ে জ্বালান হবে।

রাজকুমারীর বিয়ের কথা শুনে তিন ভাই বেরিয়ে পড়ল। পথে একটা মরা ময়না দেখতে পেল। তৃতীয় ভাইটি ঐ ময়নাটাকে হাতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বলত আমি কি পেয়েছি ?"

"আরে ওটাকে ফেলে দে। ওটা দিয়ে কি হবে ?" বড় ভাই ধমক দিল।

"হয়ত কোন কাজে আসতে পারে।" এ কথা বিড় বিড় করে বলে ছোট ভাই মরা ময়নাটাকে লুকিয়ে ফেলল।

কিছুদূর যাওয়ার পর ছোট ভাই পর পর পেল, একটি মাটির পাত্র, ভেড়ার দুটো সিং, একটি কাঠের খুঁটি ও একটি ছেঁড়া জুতো।

বড় ভাই প্রত্যেকটা কুড়ানোর সময় বারণ করছিল কিন্তু ছোট ভাই প্রত্যেকটাই লুকিয়ে নিয়ে চলল।

প্রথমে বড় ভাই রাজকন্যার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলল, "আজকের দিনটি বেশ মনোরম। তবে এখানে খুব গরম।"

নরওয়ের লোককথা

"ওটা আরও গরম।" বলে রাজকন্যা এক জ্বলন্ত চুল্লি দেখাল। তাতে ছিল দুটো শলাকা। জ্বলন্ত শলাকা দেখে বড় ভাইয়ের মুখে কথা সরল না।

দ্বিতীয় ভাইটির বেলায়ও তাই হল।

তৃতীয় ভাই বলল, "আজ খুব ভাল দিন। এখানে তত গরম বা ঠাণ্ডা নেই।

রাজকুমারী জ্বলন্ত চুল্লি দেখিয়ে বলল, "ওদিকে গরম দেখতে পাওয়া যাবে।"

"ঐ চুল্লিতে এই ময়না ভেজে নিতে পারি।" ছোট ভাই বলল।

"ওটা টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যাবে।" রাজকুমারী বলল।

"এই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা যাবে।" ছোট ভাই জবাব দিল।

"দড়িটা ঢিলে হয়ে ছিঁড়ে যাবে।" রাজকুমারী বলল।

"এই খুঁটিটা গুঁজে আরও শক্ত করে নেওয়া যাবে।" ছোট ভাই জবাবে বলল।

"প্রত্যেক কথা পেঁচিয়ে বলার অভ্যাস দেখছি বেশ আছে।" রাজকুমারী বলল।

"আমার কথা আর কতটুকু প্যাঁচানো, এটাকে দেখুন,।" ছোট ভাই ভেড়ার একটা সিং বের করে দেখাল।

"এ রকম জিনিস তো আমি কোথাও দেখিনি।" রাজকুমারী বলল।

"এই ধরণের আরও একটা আছে। এই যে।" ছোট ভাই অন্য সিং দেখাল।

"আমাকে পরাজিত করার জন্য অনেকখানি দলিত হতে হচ্ছে দেখছি।" রাজকুমারী বলল।

"আমি দলিত হই না, দলিত হয় এই জুতো।" ছোট ভাই জুতো বের করে দেখাল।

তারপর রাজকুমারীর মুখে আর কথা সরল না। অবশেষে রাজকুমারী নিজের পরাজয় স্বীকার করল। ছোট ভাই পেল অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।

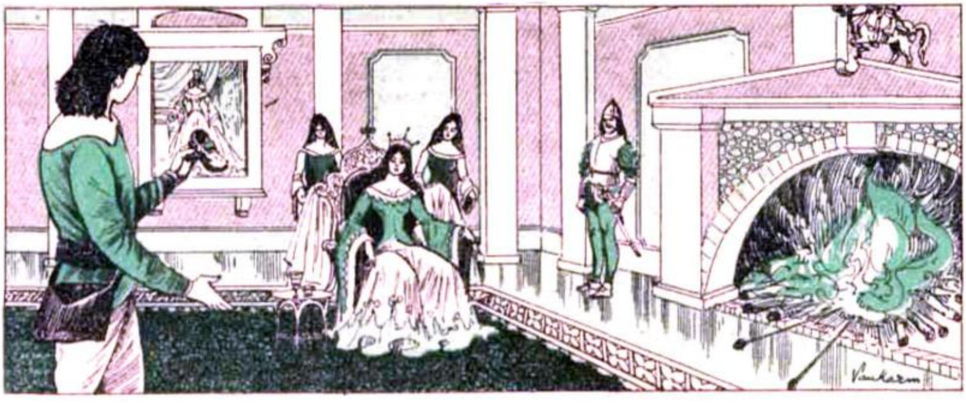

চুরি বিদ্যা

প্রাচীন কালে কোন এক রাজার দরবারে এক মহাপণ্ডিত ছিলেন। একবার দরবারে প্রশ্ন ওঠে কোন্ বিদ্যা সব চেয়ে কঠিন। বিভিন্ন পণ্ডিত নিজের নিজের মত প্রকাশ করেন। কিন্তু দরবারের ঐ মহাপণ্ডিত বলেন, "মহারাজ, সব চেয়ে কঠিন বিদ্যা হল চুরি বিদ্যা।"

এই কথা শুনেই রাজা রেগে গিয়ে বললেন, "তা কি করে হয়? যে লেখা পড়া করে না, সেই তো চুরি করে। চোরদের মধ্যে প্রতিভাশালীকে দেখতে পাই না।"

"মহারাজ, পরীক্ষার মধ্য দিয়েই সত্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়। চুরি করতে গেলেই টের পাবেন চুরি বিদ্যা কত কঠিন।" মহাপণ্ডিত বললেন। রাজাও পরীক্ষা করে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

"আপনি এই পোষাকে গেলে আপনি যা চাইবেন, যা নেবেন কেউ কিছু বলবে না। চোর এমন পোশাক পরে চুরি করতে যায় যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে। সবার চোখে ধূলো দিয়ে তাকে চুরি করে আনতে হয়। আপনারও উচিত অন্য পোশাকে চুরি করতে যাওয়া।" মহাপণ্ডিত বললেন।

রাজা তাতে রাজী হলেন। রাজা গায়ে মেখে নিলেন কাঠ কয়লার গুঁড়ো। কালো পোশাক পরে নিলেন। মাঝ রাতের অন্ধকারে বেরুলেন। রাজা ধনীদের পাড়ার দিকে গেলেন প্রথমে। কিন্তু ধনীদের বাড়ির ভেতর ঢোকা রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাড়ির দরজা বিরাট এবং মজবুত। বাড়ির সামনে পাহারাদার বসানো। রাজা বুঝলেন বড় লোকের পাড়ায় চুরি করা সম্ভব নয়।

রাহুল ভট্টাচার্য

রাজা ভাবলেন মহাপণ্ডিত তো আর বড় লোকের বাড়িতেই চুরি করতে হবে এমন কোন কথা বলেন নি। যে কোন বাড়ি থেকে ছোট খাট জিনিস চুরি করলেই পারি। আমি চুরি করতে পারলেই মহা-পণ্ডিতের মত ভুল প্রমাণিত হবে। রাজা এবার গরিবদের বস্তিতে গেলেন। সেখানেও বাড়িগুলোর দরজা বন্ধ ছিল।

অবশেষে এক কুমোরের বাড়ির সামনে দেখতে পেলেন মাটির হাঁড়ি থরে থরে সাজানো আছে। বাড়ির ভিতরে লোক ঘুমোচ্ছে। রাজা ভাবলেন এর থেকে একটি হাঁড়ি চুরি করতে পারলেই তো হয়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে উপরে যে হাঁড়ি আছে তা নাবানো যায় না। হাতের নাগালের বাইরে সেই হাঁড়ি। তাই মাঝের একটি হাঁড়ি ধরে আস্তে আস্তে টান দিলেন। সাথে সাথে হুড়মুড় করে উপরের হাঁড়িগুলো পড়ে যেতে লাগল রাজার উপর। রাজা নিচে পড়ে গেলেন। তার মাথায় গায়ে চার পাশে হাঁড়ির ঢিপি।

হুড়মুড় করে হাঁড়িগুলো পড়ার আওয়াজ পেয়ে কুমোর বাড়ির সবাই জেগে গেল। বেরিয়ে চোরকে দেখেই সবাই "চোর চোর" বলে চিৎকার করে উঠল। প্রতিবেশীরা রাজাকে চিনতে পারল না। চোর ভেবেই রাজাকে ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে বলতে লাগল, "ব্যাটা, হারামজাদা, চুরি করার আর জিনিস পাওনি। লোকে ঘটি বাটি চুরি করে আর তুমি এসেছ কিনা মাটির জিনিস চুরি করতে! উঁ। পাজি। নচ্ছার! একটা হাঁড়ি চুরি করতে হাজারটা হাঁড়ি ভাঙ্গলে।"

রাজা ধোলাই খেয়ে কোন রকমে প্রাণে বেঁচে ফিরে এলেন ভোর রাত্রে।

পরের দিন দরবারে রাজা মহাপণ্ডিতকে বললেন, "পণ্ডিত মশাই, আপনার কথাই ঠিক। চুরি বিদ্যাই সবচেয়ে কঠিন।"

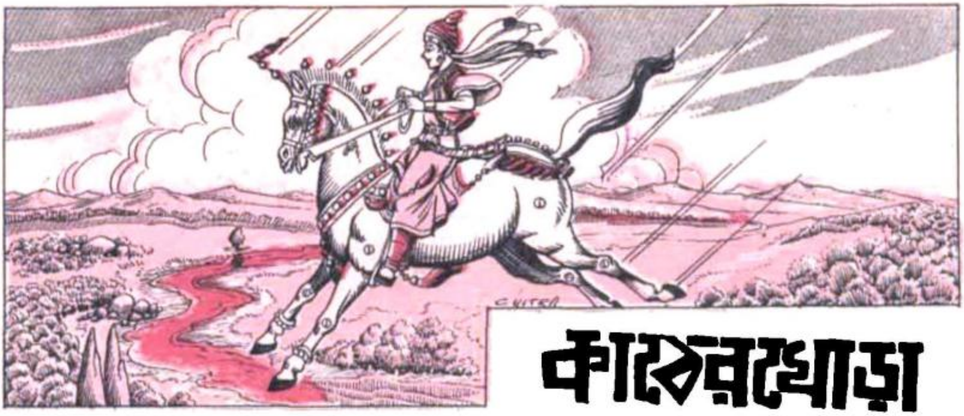

কাঠের ঘোড়া

দুই

এমনি করে বাদশা সাবুরের আনন্দমুখর নওরোজ উৎসব সেবার এক বিষাদে পরিণত হল।

এদিকে কামর-অল-আকমর উপরে উঠছে তো উঠ্যছেই, লাগাম ধরে কত টানাটানি, আগেকার সেই বোতামটা নিয়ে কত নাড়া চাড়া, কিছুতেই কিছু হয় না, উপরে উঠ্যার বেগ শুধু একটু কম বেশী হয় —এই মাত্র। ঘোড়া মেঘের এলাকা ছেড়ে কখন আরও উপরে উঠে গেছে, এবার যে চাঁদ-সূয্যির দেশে হাজির হতে চলল। কামর-অল-আকমর এবার রীতিমত ভয় পেয়ে গেল, যদি নামতে না পারে! বেলাতো এদিকে পড়ে এসেছে, বাড়ি ফিরবে কেমন করে!

ভয় পেয়ে যারা ঘাবড়ে যায়, চিন্তাশক্তি লোপ পায়, কামর-অল-আকমর সে দলে পড়ে না। তার হঠাৎ মনে হল, যে কারিগর এর উঠ্যবার কল তৈরি করেছে সে কি আর নামবার ব্যবস্থা করে রাখেনি। রেখেছে নিশ্চয়ই। কামর-অল-আকমর তখন উপরে উঠতে উঠ্যতেই ঘোড়ার গায়ে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল। দেখতে পেল বাঁ কানের নিচে মোরগের ঝুঁটির মত কি একটা আছে। সেটায় মোচড় দিতেই ঘোড়া নিচের দিকে নামতে শুরু করল। আনন্দে আকমর বলে উঠ্যল, 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ জয় আল্লা'। তারপর ডাইনে বাঁয়ে দুই দিকের চাবি ঘুরিয়ে লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে উপর নিচ এদিক ওদিক

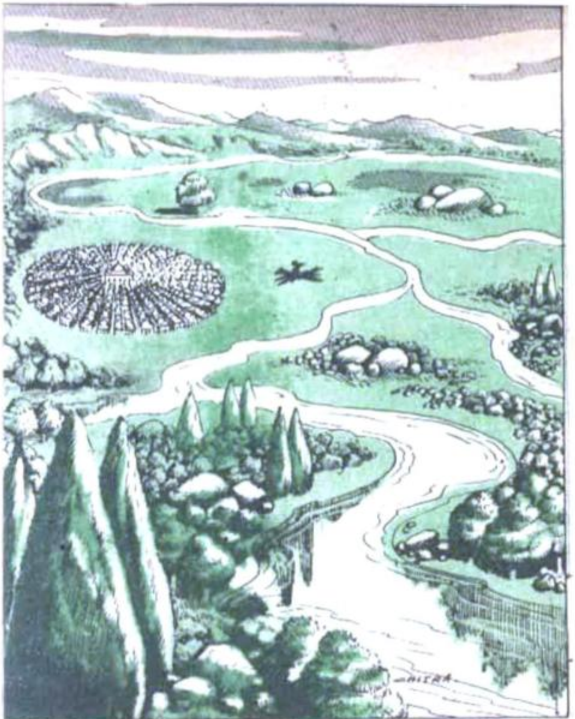

চালাল। নিজের ইচ্ছামত ঘোড়া চালানো অভ্যাস করে নিল। প্রথমে অনেক উঁচুতে উঠে গিয়েছিল সে, তাই নিচে নামতে অনেক সময় লেগে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আকাশে চাঁদ উঠেছে। ঘোড়া উড়ে চলেছে কত অজানা অচেনা দেশের উপর দিয়ে। পাহাড়, পর্বত, নদী, নালা, সবুজ মাঠ পেরিয়ে হঠাৎ দেখলো একটি শহর। ঘোড়াটা আরও নিচে নামিয়ে তার উপর পাক খেতে লাগল কামর-অল-আকমর। দেখল শহরের মাঝখানে একটা বিরাট প্রাসাদ। প্রাসাদের চারদিকে বেশ উঁচু পাঁচিল, তাতে বসানো রয়েছে নানা ধরণের ভয়ঙ্কর অস্ত্র। আর নিচে প্রায় চল্লিশ জন খোজা পাহারা দিচ্ছে বাড়িটা। কামর-অল-আকমরের খুব খিদে পেয়েছিল, ভাবল রাতের মত এই বাড়িতে আশ্রয় নেবে। এত বড় বাড়ি যখন, তখন খাবার কিছু মিলবেই।

এই কথা ভেবে সে বাড়িটার উপর কয়েক বার ঘোড়ায় চড়ে চক্কর দিল। তারপর ক্লান্ত পাখীর মত ঘোড়াটাকে নামাল বাড়ির ছাদের উপর। তখন নিশুত রাত, বাড়ির আর কেউ জেগে নেই। কামর-অল-আকমর কান পেতে শুনলো কোন শব্দ শোনা যায় কিনা। কিন্তু না মানুষের কোন সাড়া শব্দ নেই। সে ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল। নামে আর কান পেতে শোনে —না, কোন শব্দ নেই—শোনা যায় শুধু ঘুমন্ত মানুষের নিশ্বাসের শব্দ।

দূরে একটা কামরায় আলো দেখা যাচ্ছিল। ওখানে গেলে যদি খাবার মেলে, এই ভেবে কামর-অল-আকমর পা টিপে টিপে রওনা হল। গিয়ে দেখে সেটা একটা হারেমের কামরা। দরজার সামনে একটা ভীমকায় কদাকার খোজা ঘুমোচ্ছে। দরজায় ঝুলছে মণিমুক্তো ঝালর দেওয়া রেশমী পর্দা। ঘরে বাতি জ্বলছে, চার কোণে চারটি মোমবাতি। খোজার পাশ কাটিয়ে পরদা সরিয়ে চোরের মত ঢুকল কামর-অল-আকমর। ঢুকেই সে অবাক

হয়ে গেল। ঘরের মাঝখানে এক রত্নখচিত হাতীর দাঁতের পালঙ্কে ঘুমিয়ে আছে এক অপরূপ রাজকন্যা। মুখখানা তার গোলাপ আর চাঁদকেও হার মানায়। ঘন কাজল দিয়ে আঁকা ধনুকের মত দুটি ভ্রূ, চিবুকে মসীবিন্দুর মত ছোট্ট একটি তিল। দেখে চোখ ফেরাতে পারেনা কামর-অল-আকমর।

বিস্ময়ের ভাব একটু কাটতে না কাটতেই সে দেখল পালঙ্কের চারিদিকে মসৃণ শ্বেত-পাথরের মেঝেতে ঘুমিয়ে আছে চারটি বাঁদী।

কামর-অল-আকমর এই রাজকন্যার সাথে দুটো কথা না বলে আর পারছে না। তাই সে দুরু দুরু বুকে এগিয়ে গেল পালঙ্কের কাছে। আর রাজকন্যার পোষাকের এক প্রান্ত ধরে সে টান দিল। রাজকন্যা পদ্মের পাপড়ির মত চোখ মেলে বলল, "কে, কে তুমি?"

রাজকন্যা রাগ করে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাগ করা আর তার হল না। কামর-অল-আকমরকে দেখে তার পলক পড়ে না।

আকমর বলল, "অধীনের নাম কামর-অল-আকমর, পারস্যের বাদশাহের ছেলে আমি, তোমার দাস।"

"কি করে এলে এখানে, এত খোজা আর সান্ত্রীদের চোখ এড়িয়ে?" রাজকন্যা জিজ্ঞেস করল।

কামর-অল-আকমর বলল, "খোদা আমায় এখানে পৌঁছে দিয়েছেন, আর

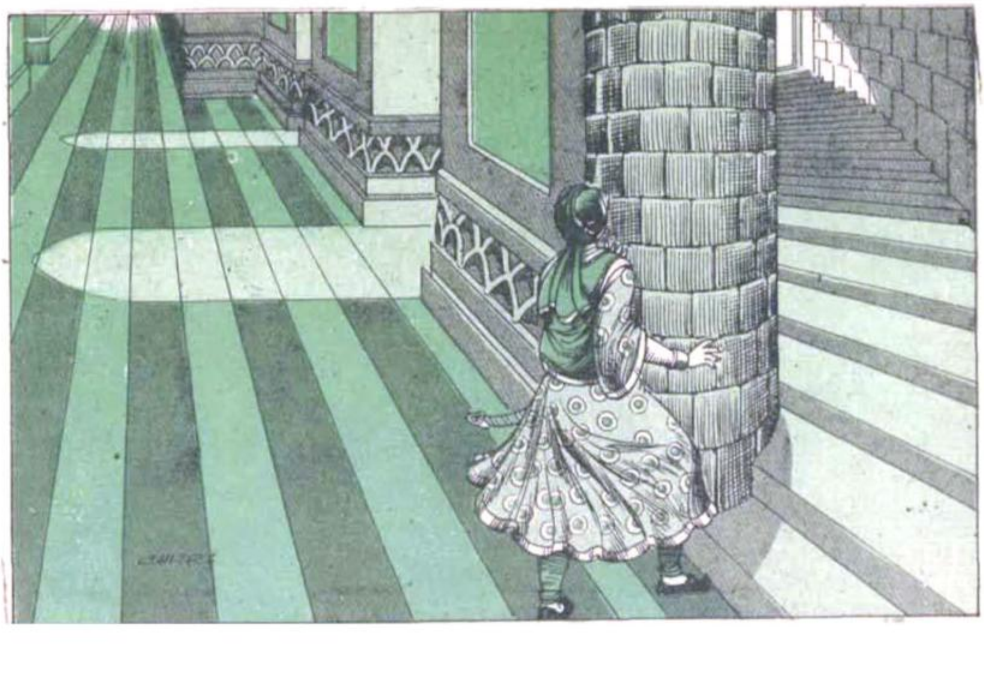

দিয়েছে আমার ভাগ্য। আজ রাতের মত শুধু এখানে একটু আশ্রয় চাই। সারারাত তোমাকে প্রাণ ভরে দেখব, আর ভোর হতে না হতেই আমি এখান থেকে চলে যাব।”

এই সুদর্শন যুবককে রাত ভোর হলেই আর দেখতে পাবে না শুনে বুকের মাঝে যেন একটা মোচড় দিয়ে উঠল রাজকন্যার। রাজকন্যা বলল, “আপনি যে দেশে এসেছেন তার নাম সানা। সানার লোকেরা অসভ্য বা অভদ্র নয়। অতিথি এলে তার উপযুক্ত পরিচর্যা না করে অত তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেয় না। সাধারণ লোকেরাই দেয় না, আর আপনি তো রাজবাড়িতে এসেছেন।

“আমার পিতা এখানকার সুলতান, কয়েকদিন অন্তত তাঁর মেয়ে সামসুল নাহারের সেবা না নিয়ে আপনি কিছুতেই যেতে পারবেন না।”

আকমর খুশি হয়ে ধন্যবাদ জানাতে যাচ্ছিল, রাজকন্যা প্রশ্ন করল, “আপনি কি সেই রাজকুমার নন যিনি কাল এসেছিলেন, আমাকে বিয়ে করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তিনি তো আপনার মত এত সুদর্শন ছিলেন না! এবং ছিলেন না বলেই বাবা তাঁর সাথে আমার বিয়ে দিতে রাজী হননি। আপনি অবশ্য অনেক বেশী সুন্দর।” রাজকুমারী বিছানা থেকে নেমে রাজকুমারের

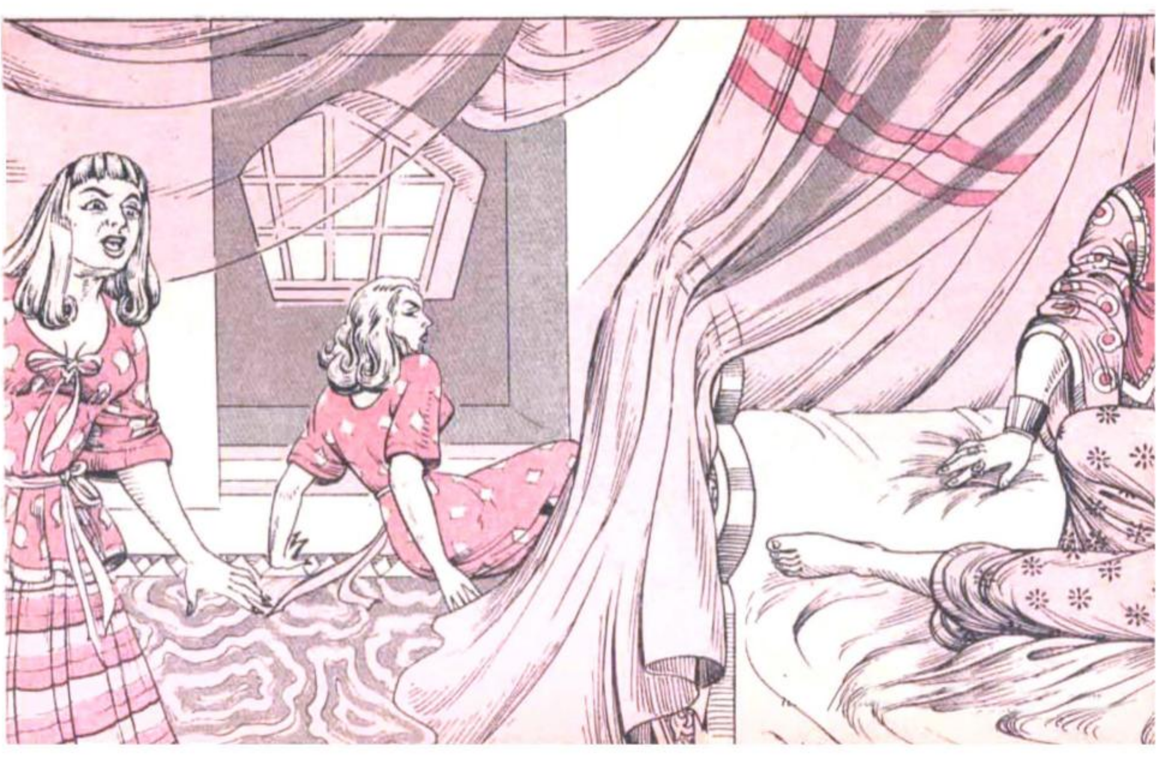

দিকে এমন ভাবে এগিয়ে যেতে লাগল যেন তাকে আলিঙ্গন করবে।

ততক্ষণে দাসীরা উঠে পড়ল। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "রাজকুমারী ইনি কে?"

"ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি ইনি আমার বিছানার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কাল যে রাজকুমার এসেছিলেন এঁকে দেখে কি সেই রাজকুমার মনে হয়?" রাজকুমারী জিজ্ঞেস করল।

চারজন দাসী এক সাথে বলে উঠল, "না না ইনি অন্য কেউ। এঁর পাশে ঐ রাজকুমার দাঁড়াতেই পারে না। এঁর দাস হওয়ার যোগ্যতাও ঐ রাজকুমারের নেই। এমন সুদর্শন যুবক আমরা কোনদিন দেখিনি।"

তারপর ঐ চারজন দাসী ঘুমন্ত নিগ্রোদের কাছে গিয়ে ধমক দিয়ে বলল, "আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় পরপুরুষকে তোমরা কেন অন্তঃপুরে ঢুকতে দিলে?"

চোখ ছানাবড়া করে নিগ্রোরা উঠে দাঁড়িয়ে খাপ থেকে তরবারি বের করতে গিয়ে দেখে তাদের খাপে তরবারি নেই। ওরা রাজকুমারীর ঘরে এসে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কামরকে জিজ্ঞেস করল, "ও মশাই আপনি কি মানুষ না শয়তান?"

কামর রাগে গর্জে উঠে তরবারি বের করে বলল, "তোমাদের এতবড় সাহস! এক রাজকুমারকে শয়তান বলছ? আমি এই রাজার জামাই। এই রাজকুমারীর

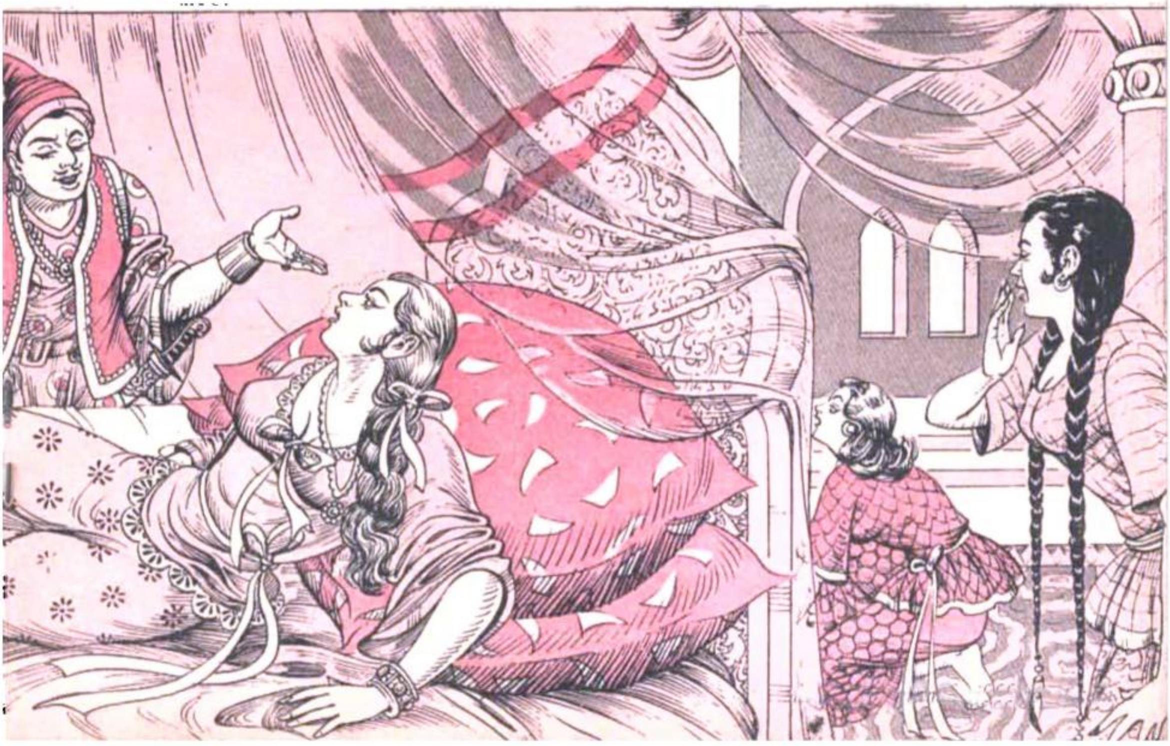

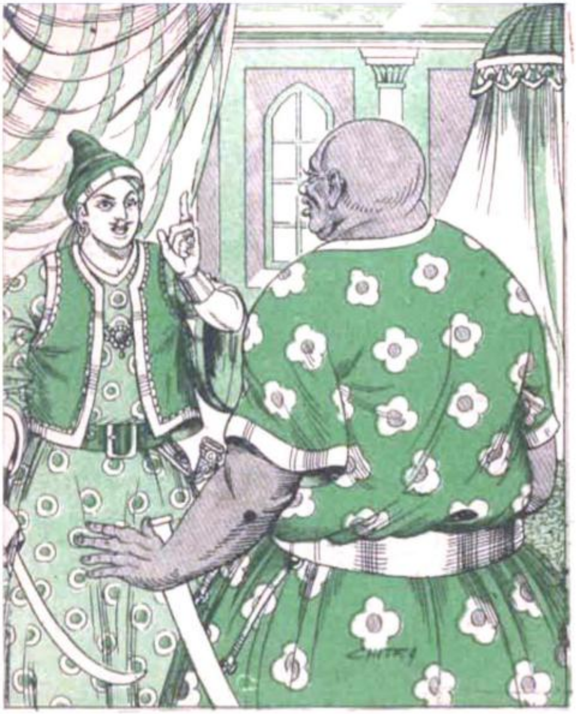

সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেছে। আমার অধিকার আছে অন্তঃপুরে আসার!"

"আজ্ঞে আপনি আমাদের রাজকুমারীর যোগ্য বর।" এই কথা বলে ওরা বাদশাহের কাছে ছুটে গিয়ে মাথার চুল টেনে বুক চাপড়ে বলল, "জাঁহাপনা আপনি তাড়াতাড়ি চলুন। রাজকুমারীকে বাঁচান। একটা শয়তান রাজকুমারের রূপ ধরে অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছে।"

বাদশাহের এত রাগ হল যে বলার নয়। তাঁর ইচ্ছে করল তক্ষুনি নিগ্রোদের মাথা কেটে ফেলেন কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে রাগ দমন করে বললেন, "পাজি বদমাইশের দল শয়তান যখন অন্দর মহলে ঢুকছিল তখন তোমরা কি করছিলে? তোমাদের আমি রাতদিন পাহারা দেবার জন্য অন্তঃপুরে রেখেছি। তোমরা ঠিকমত পাহারা দেওনি কেন? কি করছিলে তোমরা?" তারপর বাদশা সোজা রাজকুমারীর ঘরে ঢুকলেন।

দাসীরা রাজকুমারীর ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল। বাদশাহ ওদের বললেন, "রাজকুমারী কেমন আছে?"

"হুজুর আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় কি হয়েছে জানি না। আমাদের ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি আমাদের রাজকুমারী এক সুন্দর যুবকের সাথে কথা বলছেন। এত সুন্দর সুদর্শন যুবককে আমরা হুজুর কোনদিন দেখিনি। আমরা প্রশ্ন করেছিলাম যুবক-টিকে। যুবকটি বলল রাজকুমারীর সাথে তার নাকি বিয়ে হয়ে গেছে। এ ছাড়া আমরা আর কিছু জানিনা হুজুর। তাকে খুব সৎ ও ভদ্র মনে হচ্ছে হুজুর।

একথা শুনে বাদশাহ কিছুটা যেন ভরসা পেলেন। মেয়ের ঘরের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন কামরকে। কামর তার কন্যার সাথে কথা বলছে।

মেয়ে অত সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে দেখে বাদশাহের তার উপর রাগ হল। তরবারি টেনে বের করে ঘরের ভিতরে ঢুকলেন। পরক্ষণেই কামর রাজ-কন্যার কাছে জানতে পারল তরবারি হাতে

ঘরে যিনি ঢুকেছেন তিনিই তার বাবা। অগত্যা কামরও নিজের খাপ থেকে তরবারি বের করল। নবাগতের সাহস দেখে বাদশাহ অবাক হলেন। পরমুহূর্তেই তরবারি হাতে কামর বাদশাহের দিকে ধেয়ে গেল। বাদশাহের মনে হল নবাগতের চেয়ে তিনি যেন দুর্বল। বললেন, "শোন, তুমি কি মানুষ না শয়তান?"

কামর তরবারি নামিয়ে বলল, "আপনার এবং আপনার মেয়ের সম্মানার্থে আমি তরবারি নামিয়ে ফেললাম। তা না হলে পারস্যের রাজকুমার কখনও কারও কাছে অপমান সহ্য করে না। এতক্ষণে আপনাকে এবং আপনার রাজ্যকে ধ্বংস করে দিতে পারতাম, বুঝেছেন?"

এই কথা শুনে বাদশাহ ভয় পেলেন। কামরের সাথে নিচু গলায় কথা বলতে শুরু করে দিলেন। কামরের কাছে গিয়ে বললেন, "কোন রাজকুমারের কি বিনা নিমন্ত্রণে আসা উচিত? অন্তঃপুরে ঢোকা উচিত? আমার মেয়ের সাথে এভাবে মেলামেশা করে আমাদের বংশের মুখে কালি দিতে চাইছ। বহু রাজকুমার আমার মেয়েকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। কিন্তু আমি মত দিইনি। আর তুমি বেমালুম বলে দিলে আমার মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে হয়ে গেছে? হুকুম পেলেই আমার লোকজন তোমাকে

এক্ষুনি কেটে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। কে তোমাকে বাঁচাবে এখানে?"

আপনার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পেলাম। আচ্ছা বলতে পারেন, আমার চেয়ে ভাল পাত্র আপনার মেয়ের জন্য জুটবে? আমার চেয়ে সাহসী এবং ধনী পাত্র জোটাতে পারবেন?" কামর বলল।

তোমার কথা হয়ত সত্য। সত্যিই যদি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে চাও তাহলে কাজী ছাড়া তো হবে না। তা ছাড়া বংশ মর্যাদা অনুযায়ী অনেকগুলো কাজও করতে হবে। ওসব না করে গোপনে আমার মেয়েকে বিয়ে করলে আমার মান সম্মান বলে আর কিছু থাকবে না।" বাদশাহ বললেন।

"ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু এখন যদি আপনি সেপাইদের ডাকেন তাতে কি আপনার এবং আপনার মেয়ের সম্মান থাকবে? থাকবে না। অতএব, যা বলছি তাই করবেন।" কামর বলল।

"বল শোনা যাক।" বাদশাহ বললেন।

"আপনার সামনে এখন দুটো পথ খোলা আছে। এক, আমার সাথে যুদ্ধ করা। আর যুদ্ধে হেরে গেলে আমার হাতে আপনার রাজ্য ছেড়ে দেওয়া। আর তা যদি আপনি না চান তবে আজ রাত্রের মত আমাকে এইখানেই থাকতে দিন। সকাল হলেই আপনার সমস্ত সেনাদের আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার সৈন্য সংখ্যা কত?" কামর প্রশ্ন করল।

"আমার সেনা বাহিনীতে চল্লিশ হাজার সৈন্য আছে। এছাড়া আমার গোলাম এবং গোলামের গোলাম ধরলে আরও চল্লিশ হাজার হবে। এই আশী হাজার লোকের বিরুদ্ধে তুমি যুদ্ধ করতে চাও?" বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ তাই করতে চাই। সকালের মধ্যে আপনি সমস্ত সৈন্যকে জড় হতে বলুন। আর আপনি ওদের ভালভাবে জানিয়ে দিন যে আমি রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চাই বলেই আমি একা যুদ্ধ করতে চাই। ওরা যদি আমাকে মেরে ফেলতে পারে তাহলে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক চুকে গেল। আর যদি না পারে, যদি আমি জিতে যাই, তাহলে প্রচার হয়ে যাবে যে আপনার জামাই এক অসাধারণ পরাক্রমশালী বীর।" কামর বলল।

বাদশাহ বুঝতেই পারলেন না যুবকটির এই ধরণের কথা বলার পিছনে কোন রহস্য আছে কিনা। বাদশা কামরের শর্ত মেনে নিলেন।

(আরও আছে)

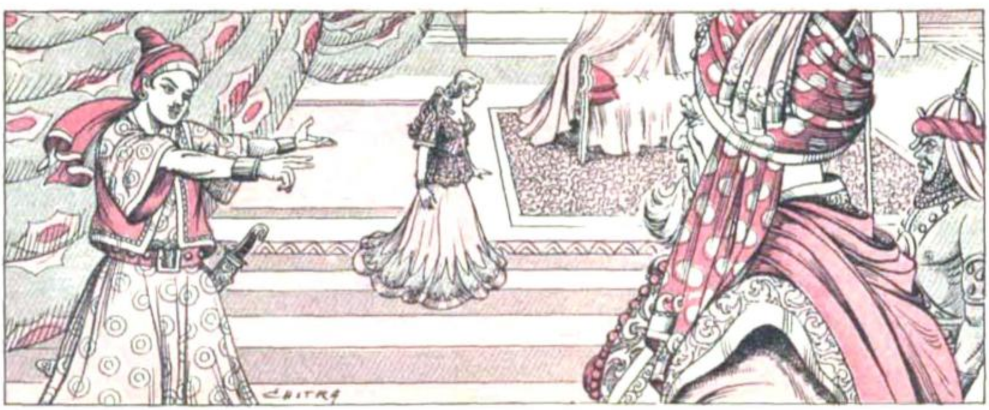

উপহার

এক জমিদার নিজের সেরেস্তায় বসে কাগজ পত্র দেখছিলেন। এক কবি তাঁর কাছে এসে তাঁকে প্রশংসা করে নানান কবিতা মুখে মুখে রচনা করে আওড়াতে লাগলেন, "আপনি ইন্দ্রের সমান, আপনার প্রতাপ ⋯"

ঐ জমিদার নিজের প্রশংসা পছন্দ করতেন না। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ খাজাঞ্চীকে ডেকে বললেন, "এই কবিকে একশো টাকা দিয়ে দাও।"

টাকার কথা কানে যেতেই কবি জমিদারকে ধন সম্পত্তিতে কুবের ও দানে কর্ণের সাথে তুলনা করে আরও কয়েকটি কবিতা আওড়াতে লাগলেন।

"একে একশো নয়, এক হাজার দিয়ে দাও।" জমিদার বললেন। কবির আনন্দের সীমা রইল না। খাজাঞ্চী কবিকে বাইরে বসিয়ে জমিদারের কাছে গিয়ে বলল, "আজ্ঞে কবিকে তাহলে ঠিক কত দেব?"

"যা দেবার আমি তো দিয়ে দিয়েছি। সে মিথ্যা প্রশংসা করছিল, আমিও ওর মনের মত কথা বলে ওকে খুশী করেছি।"

কার জয়

মগধ রাজার দুই পত্নী ছিলেন। দুজনেরই একই দিনে একই সময়ে একটি করে পুত্র জন্ম লাভ করে। এক পুত্রের নাম অমরসিংহ ও অপর পুত্রের নাম বিজয়সিংহ রাখা হল।

রূপে আর শক্তিতে দুজনের কেউ কারোর চেয়ে কম ছিল না। সমস্ত বিদ্যায় দুজনেই সমান। যুদ্ধ বিদ্যায়ও কেউ কারোর চেয়ে কম ছিল না।

আবার দুজনের মধ্যে দু'একটি ব্যাপারে পার্থক্যও ছিল। অমরসিংহ ঘোড়ায় চড়া ও খড়্গ যুদ্ধে নিপুণ ছিল। আর বিজয় সিংহ হাতীতে চড়া ও মল্ল যুদ্ধে ছিল দক্ষ। দুই রাজকুমারের মধ্যে ভালবাসাও ছিল।

রাজা বৃদ্ধ হলেন। তিনি সব সময় ভাবতেন দুজনের মধ্যে কাকে রাজ-সিংহাসনে বসানো যায়। দুজনের একই দিনে জন্ম। অতএব ছোট বড়র প্রশ্ন ওঠে না। রাজ্যও দুভাগ করা যায় না। তাই রাজা ঠিক করলেন দুজনের যোগ্যতার বিচার করবেন। যে যোগ্য প্রমাণিত হবে তাকেই সিংহাসনে বসাবেন। রাজা এবং মন্ত্রী কয়েকদিন আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁরা ঠিক করতে পারলেন না কে অধিকতর যোগ্য।

রাজকুমার দুজন জানত না যে রাজা ও মন্ত্রী তাদের যোগ্যতার বিচার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

ঐ সময় কৌশিক দেশের রাজকুমারীর স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করা হয়। স্বয়ম্বর-সভায় বিভিন্ন বিদ্যার প্রতিযোগিতা হবে বলে

ঘোষণা করা হয়েছিল। যে রাজকুমার ঐ সমস্ত প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হবে তার সাথেই রাজকুমারীর বিয়ের ব্যবস্থা হবে।

এই খবর পেয়ে রাজা এবং মন্ত্রী ঠিক করলেন দুই রাজপুত্রকেই স্বয়ম্বর সভায় পাঠাবেন। তাঁদের বিশ্বাস ঐ স্বয়ম্বর সভাতেই প্রমাণ হয়ে যাবে কে যোগ্যতর কুমার। পিতার আদেশে দুই রাজকুমার কৌশিক দেশের রাজকুমারীর স্বয়ম্বর সভায় যোগ দিতে চলে গেল।

স্বয়ম্বর সভায় বহু দেশের রাজকুমার হাজির হয়েছিল। অমরসিংহ ও বিজয়সিংহ বিভিন্ন বিদ্যায় সমস্ত রাজকুমারকে পরাজিত করে। অবশেষে অমর আর বিজয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা হল তখন ঘোড়ায় চড়ায় ও খড়্গ যুদ্ধে বিজয়ী হল অমরসিংহ। আবার মল্ল যুদ্ধ ও হাতীতে চড়ার বিষয়ে জয় হল বিজয়সিংহের। দুজনে সমান দক্ষ প্রমাণিত হল।

কৌশিক রাজা বিপদে পড়লেন। কিছু-তেই তিনি ঠিক করতে পারলেন না কে সমধিক দক্ষ। কার সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন। নিজের সিদ্ধান্ত তিন দিন পরে ঘোষণা করবেন বলে তিনি রাজকুমারদের যে যার দেশে ফিরে যেতে বললেন। তারপর কৌশিক রাজা মন্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে ঢাক পিটিয়ে ঘোষণা করলেন ঃ অমরসিংহ ও বিজয়সিংহের মধ্যে

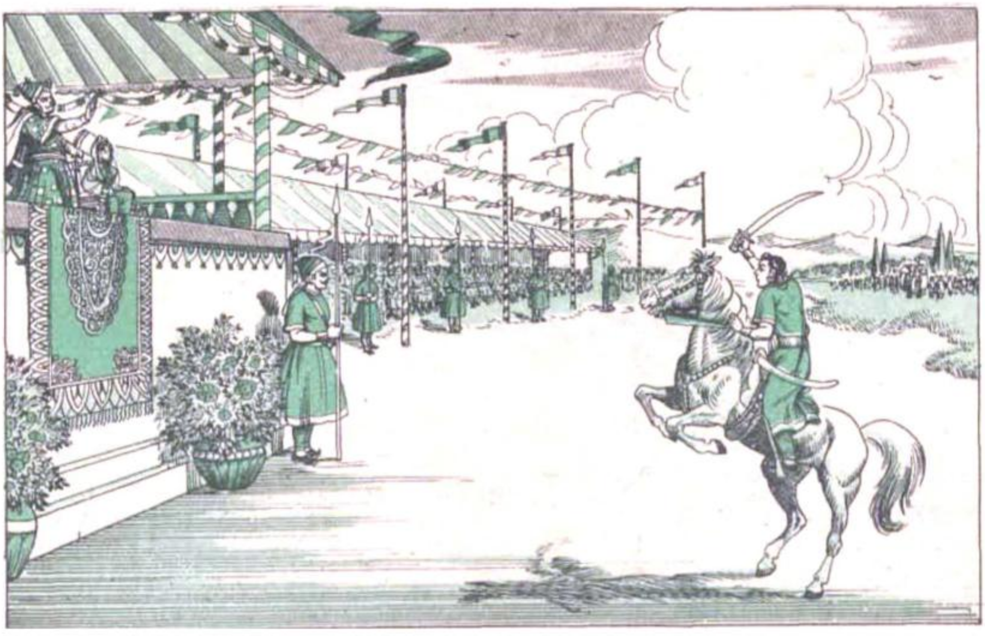

কে যোগ্যতর তা যে যুবক প্রমাণ করে দিতে পারবে তার সাথে নিজের দ্বিতীয় কন্যার বিয়ে দিয়ে অর্দ্ধেক রাজ্যও দেবেন।

এই ঘোষণার পরের দিন এক মুনি এক শিষ্যকে নিয়ে দরবারে এসে রাজাকে বলল, "মহারাজ, আপনার মেয়ের স্বয়ম্বর নিয়ে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার সমাধান আমার শিষ্য করে দেবে।"

রাজা বললেন, "কিভাবে করবে?"

এ প্রশ্নের জবাবে মুনির শিষ্য বলল, "মহারাজ, অমরসিংহ খড়্গ যুদ্ধ ও ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারে বিজয়সিংহের চেয়ে অধিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, আবার হাতীতে চড়ার ক্ষেত্রে ও মল্ল যুদ্ধে কম যোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন। কিন্তু হাতীতে বসা খড়্গবিহীন বীরের চেয়ে ঘোড়ায় চড়া খড়্গধারী বীর কি বেশি যোগ্য নন? এ ছাড়া ঘোড়া লাফিয়ে হাতীর উপর দিয়ে যেতে পারে কিন্তু হাতী ঘোড়ার উপর চড়াও হয়ে খড়্গধারী বীরকে কিছুতেই হত্যা করতে পারবে না। অপর পক্ষে হাতীতে বসা মল্লকে খড়্গধারী অশ্বারোহী সহজেই মারতে পারে। এইজন্য বিজয়-সিংহের চেয়ে অমরসিংহ অধিক যোগ্য।"

এই যুক্তি প্রত্যেকে গ্রহণ করলেন। কৌশিক রাজাও সমাধান পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

তৎক্ষণাৎ মুনি ও তার শিষ্য নিজেদের পোশাক খুলে ফেলল। মুনির পোশাকে ছিল অমরসিংহ আর শিষ্যের পোশাক পরে ছিল বিজয়সিংহ।

কৌশিক রাজা নিজের দুই কন্যার সাথে দুই রাজকুমারের বিয়ে দিলেন। আর বিজয়সিংহকে দিলেন নিজের রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজত্ব।

এই ঘটনার ফলে মগধ দেশের রাজার সমস্যাও মিটে গেল। মগধ রাজা অমর-সিংহকে রাজ সিংহাসনে বসালেন।

মহৎ উদ্দেশ্যে

এক গ্রামে আকালের লক্ষণ দেখা দিল। সেই জন্য ঐ গ্রামের ব্যবসাদার যে গ্রামে সস্তায় খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায় সেই গ্রামের দিকে রওনা হল। ওর সাথে বেরুল এক মুচি। উদ্দেশ্য সস্তায় চামড়া কেনা।

পথে এক মুনি দুজনকেই অতিথি হিসেবে বরণ করলেন। কিন্তু ব্যবসাদারকে বেশী আদর যত্ন করলেন। ওদের খাদ্যদ্রব্য ও চামড়া কিনে ফেরার সময় আবার মুনি ওদের অতিথি হিসেবে বরণ করে মুচিকে বেশী আদর যত্ন করলেন।

এতে অবাক হয়ে দুজনেই মুনিকে তাঁর এই দু ধরণের ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞেস করল।

মুনি বলল, "হে ব্যবসায়ী, তুমি যাওয়ার সময় মনে মনে কামনা করেছিলে, তুমি যে দেশে যাচ্ছ সেই দেশে খাদ্য বেশী হোক। কিন্তু মুচি কামনা করছিল, সেখানে যেন আকালের ফলে অনেক গরু মোষ মরে গিয়ে থাকে। চামড়ার দাম সস্তা হয়। সেই জন্য যাবার সময় আমি তোমাকে বেশী আদর যত্ন করেছি। কিন্তু এখন ফেরার সময়, তুমি চাইছ তোমার গ্রামে আকাল হোক। খাদ্যের দাম চড়া হোক। আর মুচি কামনা করছে গাঁয়ের মানুষের অবস্থা ভাল হোক। সবার ট্যাঁকে পয়সা থাক। তাই এইবারে আমি মুচিকে বেশী আদর যত্ন করেছি।

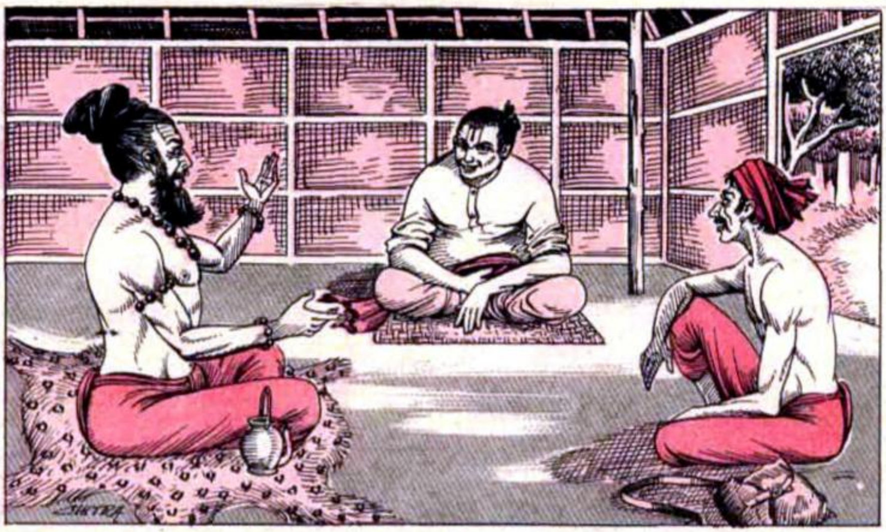

পুনর্জন্ম

মহারাজা উগ্রগুপ্তের দুই ছেলে ছিল। দুজনের প্রকৃতি দু রকমের। বড় পুত্র, যুবরাজের নাম ছিল শঙ্করগুপ্ত। সে ছিল ধূর্ত, ক্রূর এবং কঠোর স্বভাবের। সারাদিন মদের নেশায় চুর হয়ে পড়ে থাকত। ছোট ছেলে শেখরগুপ্ত সরল প্রকৃতির ও দয়ালু ছিল। সে সব সময় ধর্ম চিন্তায় মগ্ন থাকত।

শঙ্করগুপ্তকে কেউ পছন্দ করত না। কিন্তু রাজার বড় ছেলে হিসেবে সেই ছিল রাজসিংহাসনের অধিকারী। দরবারে মুখ্য মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রত্যেকে ছোট রাজকুমার শেখরগুপ্তকেই ভালবাসত। পছন্দ করত।

এই কারণে শেখরগুপ্তের উপর শঙ্কর-গুপ্ত ঈর্ষা ও দ্বেষ পোষণ করত। মনে মনে সে ঠিক করল শেখরকে একেবারে মেরে ফেলবে।

মহারাজ উগ্রগুপ্ত শঙ্করগুপ্তকেই বেশী ভালবাসতেন। তার কঠোর মনোভাব ও ক্রূরভাবকে তার পরাক্রমেরই প্রকাশ মনে করতেন।

ঈর্ষা পোষণকারী শঙ্করগুপ্ত একদিন ছোট ভাইকে বধ করার পরিকল্পনা করল। সে শেখরগুপ্তকে শিকার করতে বেরুতে বলল। দুজনে ঘোড়ায় চড়ে বনের দিকে গেল। ঘন বনে গিয়ে শেখরগুপ্তের উপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করল।

প্রাণ বাঁচাতে প্রাণান্ত। শেখরগুপ্ত অগত্যা নিরুপায় হয়ে ঘোড়ার উপর থেকে একটি গাছে উঠে পড়ল। ঠিক সেই সময় শেখরগুপ্তের খাপ থেকে তরবারি কাদা

এ. সি. সরকার (জাদুকর)

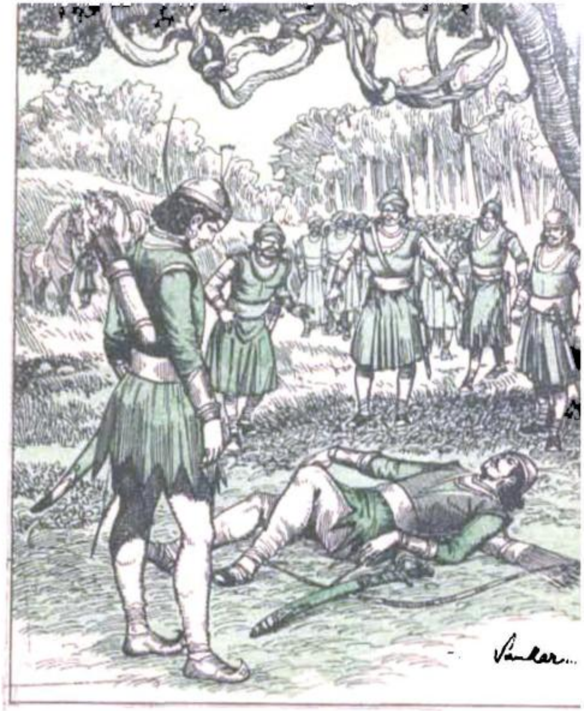

মাটিতে পড়ে যায়। তরবারির হাতলের দিক মাটির গভীরে গেঁথে যায়। তরবারির তীক্ষ্ণ মুখ আকাশের দিকে যেন তাকিয়ে থাকে। শঙ্করগুপ্তের ঘোড়া একবার পিছনের দুটো পায়ে দাঁড়িয়ে পরক্ষণে ঐ তরবারির উপর গিয়ে পড়ল। তরবারি শঙ্করগুপ্তের বগলে ঢুকে গেল। সেই মুহূর্তে শঙ্করগুপ্ত মারা গেল।

ইতিমধ্যে শঙ্করগুপ্তের লোক সেখানে পৌঁছে গেল। তারা দেখল শেখরগুপ্তের তরবারি শঙ্করগুপ্তের বগল দিয়ে ঢুকে গেছে। শঙ্করগুপ্ত মরে পড়ে আছে, পাশে দাঁড়িয়ে আছে শেখরগুপ্ত।

শেখরগুপ্তের উপর শঙ্করগুপ্তকে হত্যা করার অপরাধ চাপানো হল। নির্দোষ বলে শেখরগুপ্তের কোন প্রমাণ ছিল না। যা ঘটেছিল তা শেখরগুপ্ত বিচারককে জানাল। কিন্তু তার বক্তব্য বিচারকের কাছে গল্প মনে হল। তাই বিচারক শেখরগুপ্তের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন।

সামনের শুক্রবারে শেখরগুপ্তের উপর দশজন তীর ছুঁড়ে তাকে হত্যা করবে ঠিক হল।

ঐ দেশের নিয়মকানুন বিচিত্র ধরণের। সেই নিয়মানুসারে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেনাপতি এক লাল রুমাল নিচে ফেলে দেবে। সেই রুমাল নিচে পড়ে গেলেই তীর ছোঁড়া হবে। কোন কারণে সেই মুহূর্তে শাস্তি কার্যকরী না হলে সেই দণ্ড রদ হয়ে যাবে।

নিজের হাতে শেখরগুপ্তের মত ভাল রাজপুত্রকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হচ্ছিল বলে সেনাপতি খুব দুঃখিত ছিলেন। তিনি শেখরগুপ্তকে খুব স্নেহ করতেন। সামনের শুক্রবার দুপুরে নিজের লাল রুমাল বাঁ হাতে নিচে ফেলে শেখরগুপ্তকে মেরে ফেলার সংকেত দিতে হবে। কিছুতেই তাঁর ইচ্ছে করছিল না। স্নান খাওয়া ঘুম ছেড়ে দিয়ে সেনাপতি এ ব্যাপারে কি করা যায় ভাবছিলেন।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক সময় ঐ দেশের এক পদ্ধতির কথা সেনাপতির মনে

পড়ে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী না হলে শাস্তি মকুব হয়ে যাবে।

কিন্তু সেই সময়টাকে এড়িয়ে যাবেন কি করে! সেনাপতি ভাবলেন রাজদরবারের জাদুকর ইন্দ্রনাথ এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করলেও করতে পারে। সেনাপতি ইন্দ্রনাথের সাথে দেখা করে তাকে গোপনে নিজের মনের কথা বললেন।

ইন্দ্রনাথ এক লাল রুমাল হাতে নিলেন। রুমালের এক প্রান্তে রবারের সুতো ছুঁচ দিয়ে সেলাই করে অন্য প্রান্তকে সেনাপতির বাঁদিকের বগলের সাথে সেলাই করে দিলেন। সাধারণত সেই রুমাল সেনাপতির জামার বাঁ হাতের ভিতরে থাকবে। বাইরের দিক থেকে দেখা যাবে না। রুমালটাকে টেনে হাতে নেবার সময় সুতোতে টান পড়বে আবার হাত থেকে নিচে ফেলতে গেলেই সেটা মুহূর্তে জামার ভিতরে ঢুকে যাবে।

সেই শুক্রবার এল। সেনাপতি দুপুরে লাল রুমাল হাতে নিয়ে দাঁড়ালেন। শেখরগুপ্তকে এক থামে বাঁধা হল। তার সামনে দশজন তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। সূর্য ঠিক মাথার উপরে। প্রত্যেকে বড় বড় চোখে রুমালের দিকে তাকিয়ে আছে। সেনাপতি হাত থেকে নিচের দিকে রুমাল ফেললেন। মুহূর্তে রুমালটা কোথায় যে গেল কেউ টের পেল না। ধনুক ধারীরা অবাক হয়ে হাঁ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

দণ্ড-মুহূর্ত চলে গেল। শেখরগুপ্তের মৃত্যুদণ্ড রদ হল। সমস্বরে সমবেতরা উচ্চ কণ্ঠে বলল, "যুবরাজ শেখরগুপ্তের জয়!"

রাজা ভাবলেন কোন ঠাকুরের কৃপায় তাঁর পুত্র মৃত্যু দণ্ড থেকে রেহাই পেল। তিনি শেখরগুপ্তকে আলিঙ্গন করলেন। সেনাপতি ও জাদুকর ইন্দ্রনাথের চোখে মুখে চাপা হাসির ছাপ।

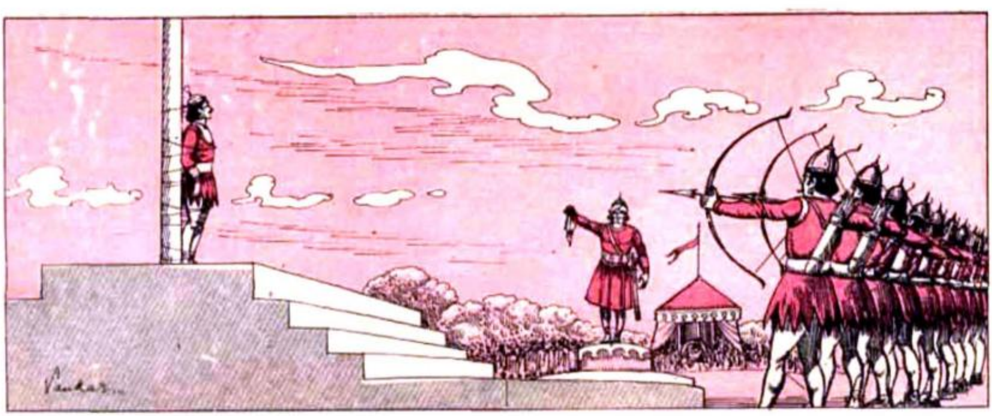

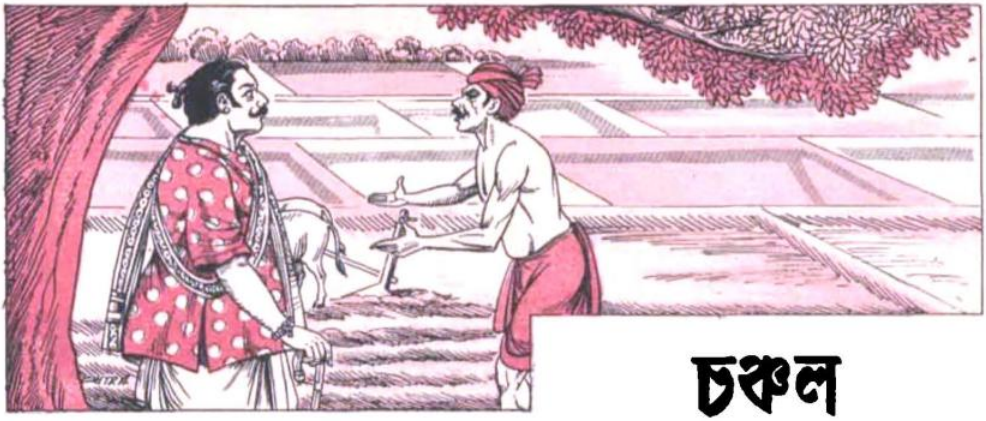

চঞ্চল

এক কিষাণ নিজের ক্ষেতে লাঙ্গল চালাচ্ছিল। লাঙ্গলের ফলা কোন এক জিনিসে যেন বাধা পেল। কিষাণ সেই জায়গায় খুঁড়ে পেল এক কাঁসার পাত্র। আর সে পাত্র ভর্তি ছিল সোনা।

পাত্রে ভর্তি সোনা দেখে কিষাণের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সোনা দিয়ে অনেক বড় বড় কাজ করার পরিকল্পনা মনে মনে ঠিক করতে লাগল। ভাবল সে অনেক বড়লোক হবে। ঐ সোনা নিয়ে চোর ডাকাতদের পাল্লায় পড়ে গেলে সব খোয়া যাবে।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে কিষাণ ঠিক করতে পারছিল না কি করবে। কিষাণের নজরে পড়ল দূরে এক বিচারক যাচ্ছেন। কিষাণ ভাবল এই সমস্ত সোনা বিচারকের হাতে দিয়ে দিলে তার কোন বিপদ হবে না। এ কথা ভেবে সে ছুটে গেল বিচারকের কাছে। গিয়ে বলল, "আপনি দয়া করে আমার ক্ষেতে একবার কষ্ট করে আসুন না।"

দুজনে ক্ষেতে পৌঁছাল। মাটির গভীরে ছিল সেই সোনা ভরা কাঁসার পাত্র। ইতিমধ্যে কিষাণের মনে পরিবর্তন দেখা দিল। কিষাণ তাড়াতাড়ি ঐ পাত্রের উপর মাটি ঢেলে দিয়ে বিচারককে বলল, "মশাই, আপনি সঠিক বিচার করতে পারেন। আপনি বলুনতো এই দুটোর মধ্যে কোন্ বলদটা ভাল ?"

এই কথা শুনে বিচারক বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলেন।

আমি এই সোনা কেন দিলাম না বিচারকের হাতে। সবার চোখ এড়িয়ে

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

এত সোনা আমি রাখব কোথায়? এই সব কথা ভাবতে ভাবতে কিষাণ আরও ভয় পেতে লাগল।

সারাদিন সে এই কথাগুলোই ভাবতে লাগল। কাজ আর কিছু হল না সেদিন।

সূর্য্য ডুবু ডুবু। কিষাণ দেখতে পেল বিচারক গাঁয়ের দিকে ফিরছেন। কিষাণের ধড়ে প্রাণ এল। সে আবার বিচারকের কাছে ছুটে গেল। আর একবার ক্ষেতের কাছে যেতে তাঁকে অনুরোধ করল। বিচারক ভাবলেন কিষাণের কোন গোলমাল হয়েছে। তাই তিনি ক্ষেতে গেলেন। ততক্ষণে কিষাণের মত আবার বদলে গেল। সে বিচারককে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা আপনি বলুন তো দেখি, কালকে আমি যে ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়েছিলাম সেটা ভাল না! আজকে যেটাকে চাষ করছি সেটা ভাল?"

এ কথা শুনে বিচারক ভাবলেন কিষাণের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তাই তিনি কোন কথা না বলে ফিরে গেলেন। বিচারকের চলে যাওয়ার পর কিষাণ আবার ভাবল, আমি কেন এই সোনা বিচারকের হাতে দিলাম না। এত সোনা আমি কোথায় লুকাব। কি ভাবে গোপনে রাখব। কিষাণ ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল।

অবশেষে সেই কিষাণ একটি থলেতে ঐ সোনা ভরা কাঁসার পাত্র পুরে থলেটি পিঠে চাপিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল।

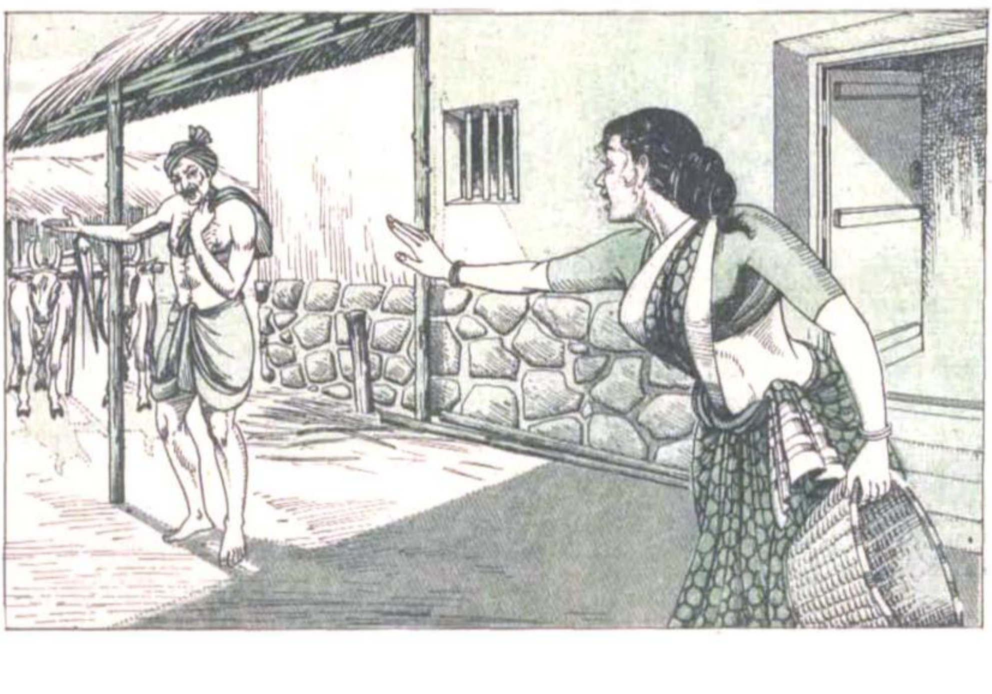

বাড়ি পৌঁছে কিষাণ বউকে বলল, "ওগো, শুনছ, বলদগুলো বেঁধে ওদের খেতে দাও। আমাকে এক্ষুণি বিচারকের কাছে যেতে হবে।"

পিঠে জিনিস ভর্তি থলেটা নিয়ে কিষাণটি তার বউয়ের সাথে কথা বলছিল। ফলে ঐ থলেতে কি আছে তা জানার কৌতূহল জাগল কিষাণ-বউয়ের মনে। সে বলল, "ওসব কাজ আমার নয়। গরু বলদ বাঁধা, খেতে দেওয়া তুমি করে থাক, তুমি করবে। এসব কাজ করে যেখানে ইচ্ছে যেতে পার। যখন ইচ্ছে ফিরতে পার।"

কিষাণ নিরুপায় হয়ে থলে নিচে রেখে বলদ বাঁধতে, তাদের খেতে দিতে চলে গেল। এই ফাঁকে কিষাণ-বউ থলে থেকে কাঁসার পাত্র বের করে দেখল। তাতে ভর্তি সোনা দেখে কিষাণ-বউয়ের চোখ তো ছানা বড়া। কিষাণ বলদগুলোকে বেঁধে খেতে দিয়ে ফিরল। ইতিমধ্যে কিষাণ-বউ ঐ কাঁসার পাত্র লুকিয়ে রেখে থলেতে ঐ আকারের একটি পাথর ঢুকিয়ে দিল।

কিষাণ কাজ করে ফিরল। থলেটাকে পিঠে ফেলে সোজা বিচারকের বাড়ি গেল।

"হুজুর, আমি আপনার জন্য একটা উপহার এনেছি।" কিষাণ বলল।

বিচারক ভাবলেন উপহার নিশ্চয় কোন দামী জিনিস হবে। থলে খুলে দেখেন একটা পাথর। বিচারকের সাথে কিষাণও অবাক

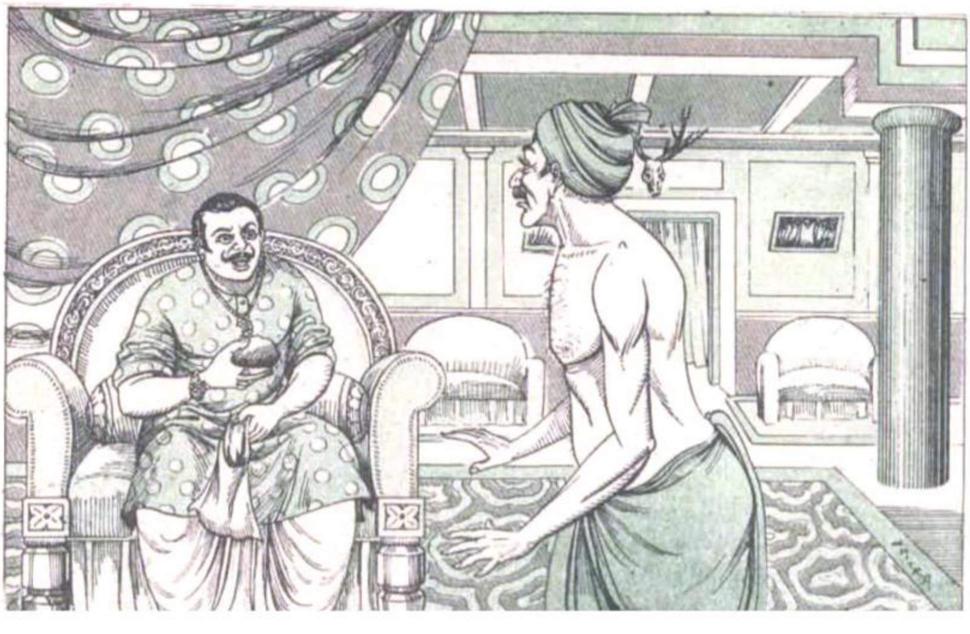

হয়ে গেল। বিচারক ভাবলেন কিষাণের এই কাজের পেছনে কোন বিশেষ কারণ আছে। কিষাণকে একটা ঘরে বন্ধ করালেন বিচারক। কিষাণ আপন মনে কি বলে দুটো চাকরকে তা আড়ি পেতে শোনার হুকুম দিলেন।

কিষাণ ঘরে একা বসে বসে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, "উফ্, কত বড় উঁচু কাঁসার পাত্র। কত সোনা।"

চাকর দুজন বিচারককে জানাল কিষাণ যা করছিল যা বলছিল। কিষাণকে ডেকে বিচারক বললেন, "ভাই, তুমি রাত্রে কি যেন বিড় বিড় করে বলছিলে, কি যেন মাপছিলে। কি ব্যাপার বলত ভাই?"

বিচারকের কথা শুনে কিষাণের মনে যেন সাহস এল। সে বলল, "আমি আপনাকেই মেপে দেখছিলাম। আর মাপতে মাপতে বলছিলাম, আপনার মাথা এত মোটা, আপনার ঘাড় এত মোটা, আপনার পেট এত উঁচু।"

কিষাণের কথা শুনে বিচারকের খুব রাগ হল। বিচারক চাকরদের বললেন, "এই অসভ্যটাকে এক্ষুনি ফাঁসি দিয়ে দাও।"

চাকরগুলো কিষাণকে নিয়ে গেল ফাঁসিতে লটকাতে। গলায় দড়ি পরানোর পর কিষাণ বলল, "থাম! বিচারকের কাছে আমার শেষ ইচ্ছা জানাতে হবে।"

চাকরগুলো কিষাণকে বিচারকের কাছে নিয়ে গেল। জানাল কিষাণের বক্তব্য।

"তুমি আমার কাছে কোন্ ইচ্ছা প্রকাশ করতে চাও?" বিচারক জিজ্ঞেস করলেন।

"দেখুন, আপনার চাকরগুলো এমন কষে গলায় দড়ি বাঁধলো যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।" কিষাণ বলল।

এ কথা শুনে বিচারক হেসে খুন হলেন। বললেন, "এই উজবুকটাকে ছেড়ে দাও।"

আর কি! কিষাণ মহানন্দে বাড়ি ফিরল। বউয়ের কাছ থেকে সোনা নিয়ে সারা জীবন সুখে কাটাল কিষাণ আর তার বউ।

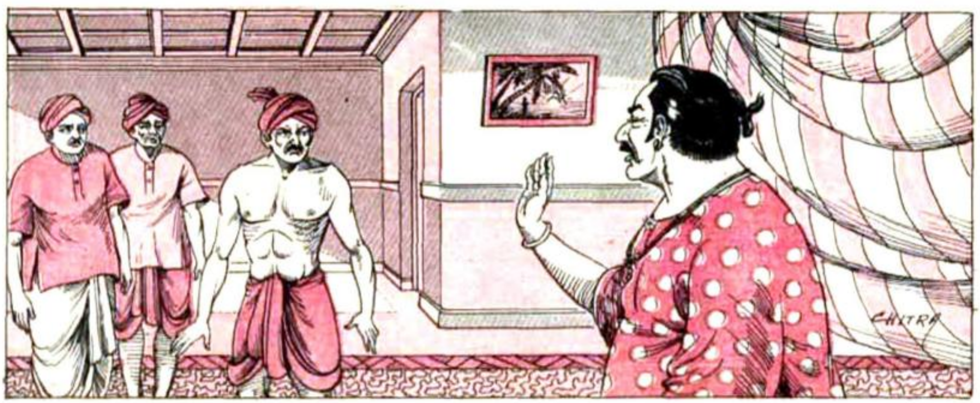

মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে সাবধান করে দিয়ে জানালেন যে যুদ্ধের বিপদ এখনও কেটে যায়নি। কিন্তু দুর্যোধন কারো কথায় কান দিতে চান নি। সভায় যে রাজারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে যুদ্ধ যে অনিবার্য এই ধারণা নিয়ে আর কোন কথা না বলে ফিরে গেলেন।

ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে আড়ালে ডেকে গোপনে জিজ্ঞেস করলেন, "সঞ্জয়, তুমি পাণ্ডব আর কৌরবদের শক্তি সম্পর্কে ভালভাবেই জান। এখন তুমি আমাকে সবিস্তারে জানাওতো পাণ্ডবদের যুদ্ধ করতে কারা বেশি উৎসাহ দিচ্ছে। তাদের মধ্যে শক্তিশালী কে?"

সঞ্জয় জবাবে বললেন, "রাজন, আমি আপনাকে একান্তে কোন কথাই বলতে চাই না। আমি যে কথা বলব তা শুনে আপনি ঈর্ষান্বিত হবেন। তাই আমি ঠিক করেছি যা বলার সবার সামনে একবারই বলব। আপনি ব্যাস এবং গান্ধারীকে ডাকুন। তাদের সামনে যা সত্য তাই বলব।"

তৎক্ষণাৎ ব্যাস এবং গান্ধারী সেখানে পৌঁছে গেল। তখন সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "রাজন, কৃষ্ণ ও অর্জুন অবতার পুরুষ। মহান বীর ওরা। তিন লোক এক হয়েও কৃষ্ণের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এহেন কৃষ্ণ আপনার ছেলেদের শেষ করবেন ঠিক করেছেন। উনি অবশ্য

কৃষ্ণের দৌত্য

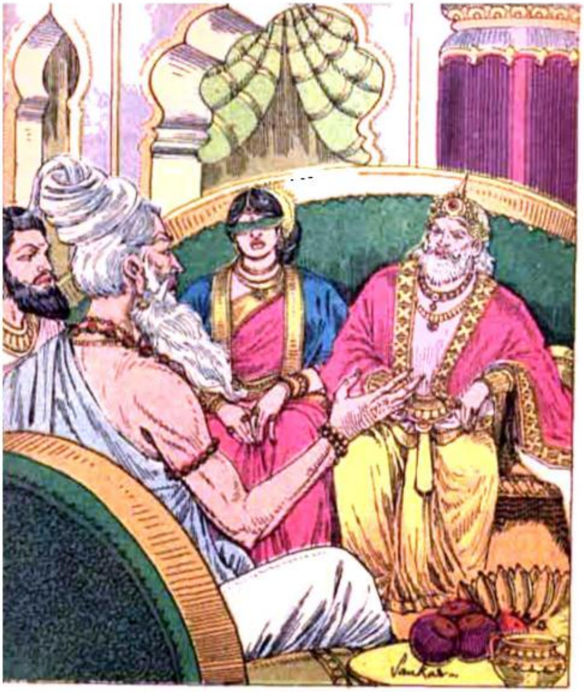

মানুষের রূপ ধরেই থাকেন। দেখে বোঝা যায় না তাঁর শক্তি কত বেশি।"

"এই রহস্য তুমি জানলে কি করে? আমি জানতে পারলাম না কেন?" ধৃতরাষ্ট্র বললেন।

"রাজন, আপনি বিদ্যাবিহীন মানুষ। আপনার স্বভাব অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আমি জ্ঞানের দ্বারাই কৃষ্ণের মহিমার পরিচয় পেয়েছি।" সঞ্জয় বললেন।

এ কথা শুনে ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, "কৃষ্ণ তোমাকে ভীষণ ভালবাসেন। সঞ্জয় কৃষ্ণকে ভাল ভাবেই জানে। কৃষ্ণের কথা মত চললে তোমার অবশ্যই মঙ্গল হবে।"

সঞ্জয় হস্তিনাপুরে চলে যাওয়ার পর যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, "তুমি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই যিনি এ বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারেন। ধৃতরাষ্ট্র এবং দুর্যোধনের ইচ্ছা কি তা তুমি সঞ্জয়ের কথায় বুঝতে পেরেছ। লোভী ধৃতরাষ্ট্র আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন। তিনি স্বধর্ম ত্যাগ করে স্নেহে অন্ধ হয়ে মূর্খ পুত্রের মতেই চলছেন। জনার্দন, আমি আমার মাতা ও মিত্রগণকে পালন করতে পারছি না, এর চাইতে দুঃখ আর কি আছে? দ্রুপদ, বিরাট প্রভৃতি রাজগণ এবং তুমি সহায় থাকতেও আমি শুধু পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলাম। কিন্তু দুরাত্মা দুর্যোধন তাও দেবে না। ধনবান লোক ধনহীন হলে যত দুঃখ পায়, স্বভাবত নির্ধন লোক তত দুঃখ পায় না। আমরা কিছুতেই পৈত্রিক সম্পত্তি ত্যাগ করতে পারি না। উদ্ধারের চেষ্টায় যদি আমাদের মৃত্যু হয় তাও ভাল। যুদ্ধ পাপজনক কাজ, তাতে দুপক্ষেরই ক্ষতি হয়। যাঁরা সাধু ব্যক্তি ও দয়ালু তাঁরাই যুদ্ধে মারা যান, অধম লোকেরাই বেঁচে থাকে। বৈর দ্বারা বৈরের নিবৃত্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়। আমরা রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না। আমরা সর্ব-প্রকারে সন্ধির চেষ্টা করবো। কুকুর প্রথমে লেজ নাড়ে, তার পর গর্জন, তারপর

দাঁত বের করে, পরে কামড়া কামড়ি করে। তাদের মধ্যে যে বলবান সেই মাংস-ভক্ষণ করে। মানুষেরও একই রকম স্বভাব, কোনও পার্থক্য নেই। মাধব, এখন কি করা উচিত? যা করলে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা পায়, এমন কোন উপায় বলে দাও। তোমার মত বন্ধু আমাদের আর কেউ নেই।"

কৃষ্ণ বললেন, "মহারাজ, আপনাদের উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থে আমি কৌরবসভায় যাব। যদি আপনাদের স্বার্থহানি না করে শান্তি স্থাপন করতে পারি তবে আমার মহাপুণ্য হবে।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "তুমি কৌরবদের কাছে যাবে এ আমার ইচ্ছে নয়। তোমার কথা দুর্যোধন রাখবে না। সে যদি তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করে তা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখজনক হবে।"

কৃষ্ণ বললেন, "দুর্যোধন পাপমতি তা আমি জানি। কিন্তু আমি যদি সন্ধির জন্য তাঁর কাছে যাই তবে আর যাই হোক লোকে আমাদের যুদ্ধপ্রিয় বলে দোষ দেবে না। কৌরবগণ আমাকে রাগাতে সাহস করবে না।"

যুধিষ্ঠির বললেন, "কৃষ্ণ, তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই কর। তুমি সফল হয়ে নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে কথা ধর্মসঙ্গত ও আমাদের মঙ্গল-জনক তা কোমল বা কঠোর যাই হোক তুমি বলবে।"

কৃষ্ণ বললেন, "আপনার বুদ্ধি ধর্মাশ্রিত, কিন্তু কৌরবগণ শত্রুতা করতে চান। যুদ্ধ না করে যা পাওয়া যাবে তাই আপনি যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধে জয়ী হওয়া বা হত হওয়াই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম, দুর্বলতা তাঁর পক্ষে নিন্দনীয়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ সন্ধি করবেন, এমন কোন সম্ভাবনা নেই। ভীষ্ম দ্রোণাদির ভরসায় তাঁরা নিজেদের শক্তিশালী মনে করেন। আপনি কোমলভাবে অনুরোধ করলে তাঁরা শুনবেন না। আমি কৌরব-সভায় গিয়ে আপনার গুণ আর দুর্যোধনের

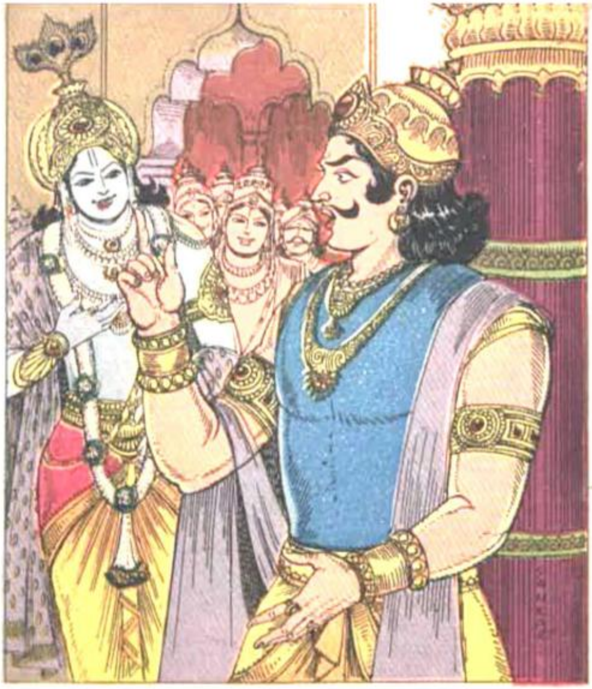

দোষ দুইই বলব, সকলের সামনে দুর্যোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আমি যুদ্ধের আশঙ্কাই করছি। নানা প্রকার দুর্লক্ষণও দেখছি, অতএব আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন।"

ভীম বললেন, "মধুসূদন, তুমি এমন ভাবে কথা বলো যাতে শান্তি হয়, যুদ্ধের ভয় দেখিও না। দুর্যোধন অধৈর্য, ক্রোধী, কিসে ভাল হয় তা বোঝে না, তাকে মিষ্ট কথা বলো। তুমি পিতামহ ভীষ্ম ও সভাসদগণকে বলো, তাঁদের প্রয়াসে যেন দুর্যোধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। আমি শান্তির জন্যই বলছি, ধর্মরাজও শান্তির প্রশংসা করেন। অর্জুন দয়ালু, তিনিও যুদ্ধ চান না।"

কৃষ্ণ হাসিমুখে বললেন, "ভীমসেন, কৌরবদের বধ করার ইচ্ছায় তুমি অন্য সময়ে যুদ্ধের প্রশংসাই করে থাক। তুমি ঘুমোও না, উপুড় হয়ে শোও, সব সময়ে অশান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চোখ বুজে থাক, প্রায়ই ভ্রূকুটি ও ওষ্ঠ দংশন কর। রাগের বশেই এমন কর। তুমি বলেছিলে, 'পূর্বদিকে সূর্যোদয় এবং পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত যেমন ধ্রুব সত্য, আমি পদাঘাতে দুর্যোধনকে বধ করব এও সেরূপ সত্য।' তুমি ভাইদের কাছে গদা স্পর্শ করে এই শপথ করেছ, অথচ আজ তুমি শান্তিকামী হয়েছ। কি আশ্চর্য, যুদ্ধকাল উপস্থিত হলে যুদ্ধকামীরও মন বিমুখ হয়! তুমিও ভয় পেয়েছ!"

কোপন-প্রকৃতি ভীম উত্তম অশ্বের মত অল্প ধাবিত হয়ে বললেন, "কৃষ্ণ, আমার উদ্দেশ্য না বুঝেই তুমি অন্য ভাব মনে করেছ। তুমি দীর্ঘকাল আমার সাথে বাস করেছ। আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত। না হয় গভীর জলে যে ভাসে সে যেমন জলের পরিমাণ বোঝে না তেমনই আমাকেও তুমি বোঝ না। মাধব, তুমি অন্যায় ভাবে আমাকে ভর্ৎসনা করেছ, আর কেউ এমন সাহস করে না। নিজের প্রশংসা করা নীচ লোকের কর্ম, কিন্তু

তোমার তিরস্কারের জন্য আমি নিজের শক্তির কথা বলছি। এই অন্তরীক্ষ ও এই জগৎ যদি সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে দুই শিলাখণ্ডের মত ধাবিত হয় তবে আমি দুই বাহু বলে তাদের রোধ করতে পারি। সমস্ত পাণ্ডব শত্রুকে আমি ভূতলে ফেলে পায়ে দলিত করব। জনার্দন, ঘোর যুদ্ধ যখন উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে বুঝতে পারবে। আমার শরীর ক্লান্ত হয় না, মন কাঁপে না, সর্বলোক ক্রুদ্ধ হলেও আমি ভয় পাই না। বন্ধুত্ব ও ভরতবংশের রক্ষার জন্যই আমি শান্তির কথা বলেছি।"

কৃষ্ণ বললেন, "তোমার মনোভাব বোঝার জন্যই আমি ভালবেসেই বলেছি, তিরস্কার বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য নয়। তোমার মহিমা, বল ও কীর্তি আমি জানি। তুমি ক্লীবের ন্যায় কথা বলছিলে সেজন্য ভয় পেয়ে আমি তোমায় উত্তেজিত করেছি।"

অর্জুন বললেন, "জনার্দন, আমার যা বলবার ছিল তা যুধিষ্ঠিরই বলেছেন। তুমি মনে করেছ যে ধৃতরাষ্ট্রের লোভ ও আমাদের দুরবস্থার জন্য শান্তি স্থাপন সহজ হবে না। কিন্তু যত্ন নিয়ে করলে আমরা নিশ্চয় সফল হব। তুমি আমাদের মঙ্গলার্থে যা করতে যাচ্ছ তা মৃদু বা কঠোর কি ভাবে সম্পন্ন হবে তা অনিশ্চিত। তুমি যদি মনে কর যে ওদের বধ করাই উচিত হবে তবে বিলম্ব না করে আমাদের সে উপদেশই দিও, আর বিচার করো না।"

কৃষ্ণ বললেন, "তুমি যা বললে আমি তাই করব, কিন্তু দৈব অনুকূল না হলে কেবল পুরুষকারে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, কিন্তু দুর্যোধনকে তা বলা ঠিক নয়। সেই পাপাত্মা তাতেও রাজী হবে না। কথা ও কাজ দ্বারা যা সম্ভব তা আমি করব, কিন্তু শান্তির আশা করি না।"

নকুল বললেন, "মাধব! ধর্মরাজ, ভীমসনে ও অর্জুনের মত তুমি শুনেছ। সে সমস্ত অতিক্রম করে তুমি যা ভাল মনে কর তাই করবে। মানুষের মতের স্থিরতা নেই।"

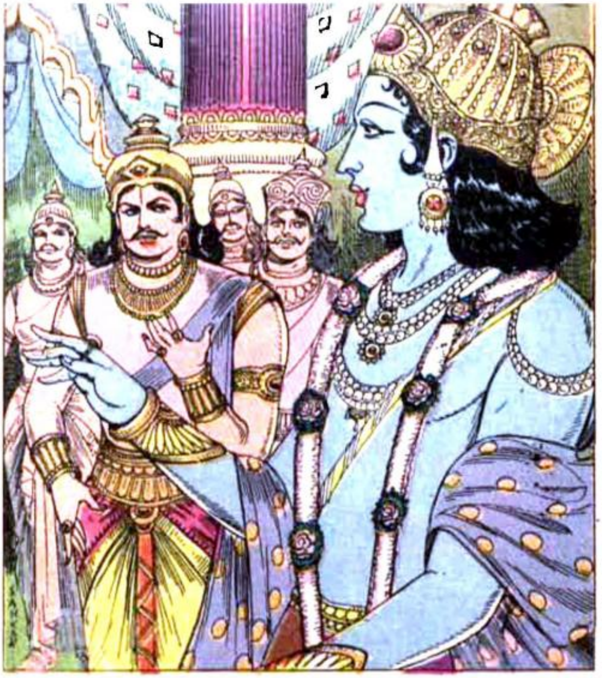

সহদেব বললেন, "কৃষ্ণ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, তবে যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে। কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। দ্যূতসভায় পাঞ্চালীর নির্যাতনের পর দুর্যোধন যদি নিহত না হয় তবে আমার রাগ কি করে শান্ত হবে। ধর্মরাজ আর ভীমার্জুন যদি ধর্ম নিয়েই থাকেন তবে আমি ধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধ করব।"

সাত্যকি বললেন, "মহামতি সহদেব সত্য কথাই বলেছেন, দুর্যোধন নিহত হলেই আমার মনে শান্তি পাব। বীর সহদেবের যে মত, সকল যোদ্ধারই সেই মত।" সাত্যকির কথা শেসে যোদ্ধারা চারদিক থেকে সিংহনাদ করে উঠলেন এবং সকলেই "সাধু সাধু" বললেন।

সাশ্রুনয়নে দ্রৌপদী বললেন, "মধুসূদন, তুমি জান যে দুর্যোধন শঠতার আশ্রয় নিয়ে পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করেছে। ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছেও সঞ্জয়ের মুখে শুনেছ। যুধিষ্ঠির পাঁচটি গ্রাম চেয়েছিলেন। দুর্যোধন তা আমলই দেয় নি। রাজ্য না দিয়ে সে যদি সন্ধি করতে চায় তবে তুমি রাজী হয়ো না। পাণ্ডবগণ তাঁদের মিত্রদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দুর্যোধনের সৈন্য বিনষ্ট করতে পারবেন। পুণ্ডরীকাক্ষ, তুমি যখন শত্রুদের সঙ্গে সন্ধির কথা বলবে তখন সর্বদা এই কেশের স্মরণ করো, যা দুঃশাসন হাত দিয়ে টেনেছিল। ভীম ও অর্জুন দীনভাবে যদি সন্ধি কামনা করেন তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ পুত্রগণ কৌরবদের সাথে যুদ্ধ করবেন। অভিমন্যুকে সামনে রেখে আমার পাঁচ বীর পুত্রও যুদ্ধ করবে। দুঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহু যদি ছিন্ন ও ধূলায় লুণ্ঠিত না দেখি তবে আমার হৃদয় শান্ত হবে কি করে?" এই বলে দ্রৌপদী অশ্রুবর্ষনে বক্ষ সিক্ত করে কম্পিতদেহে কাঁদতে লাগলেন।

কৃষ্ণ বললেন, "ভাবিণী, যাদের উপর তুমি এত ক্রুদ্ধ হয়েছ, সেই কৌরবগণ সসৈন্যে সবান্ধবে নিহত হবে। তাদের ভার্যারা রোদন করবে।"

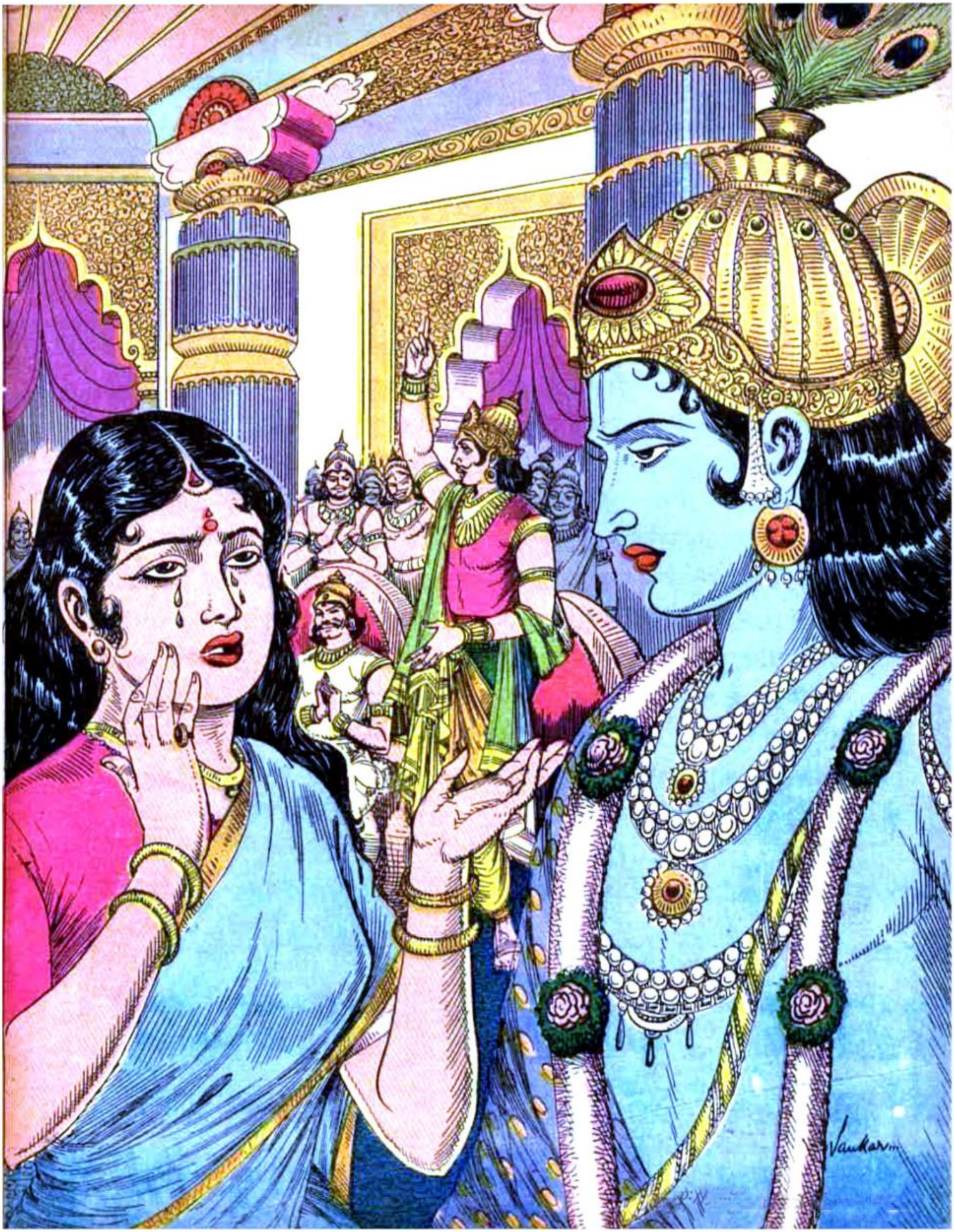

শরৎকালের শেষে কার্তিক মাসের এক প্রভাতে, শুভ মুহূর্তে কৃষ্ণ স্নানাহ্নিক সেরে সূর্য ও অগ্নির উপাসনা করলেন। তারপর তিনি সাত্যকিকে বললেন, শঙ্খ চক্র গদা ও তূণীর শক্তি ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অস্ত্র আমার রথে রাখ। শত্রুকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।" কৃষ্ণের অনুগামীগণ তাঁর রথ প্রস্তুত করল।

পাণ্ডবগণ এবং দ্রুপদ বিরাট প্রভৃতি কিছুদূর পর্যন্ত অনুগমন করলেন।

যুধিষ্ঠির বললেন, "জনার্দন, যিনি আমাদের ছোটবেলা থেকে বড় করেছেন, দুর্যোধনের ভয় ও মৃত্যুসঙ্কট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জন্য বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছেন, পুত্র বিরহে কাতর হয়ে আছেন, আমাদের সেই মাতাকে তুমি অভিবাদন ও আলিঙ্গন করে সান্ত্বনা দিও। আমরা যখন বনে যাই তখন তিনি কেঁদে আকুল হয়ে আমাদের পিছনে পিছনে ছুটেছিলেন। আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলাম। তুমি ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ রাজগণকে আমাদের হয়ে অভিবাদন করো। আর মহাজ্ঞানী বিদুরকে আলিঙ্গন করো।"

কৃষ্ণের সারথি দারুক দ্রুতবেগে রথ চালালেন। কিছুদূর যাবার পর নারদ দেবল মৈত্রেয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরশুরাম প্রভৃতি মহর্ষিগণ কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, "মহামহি কৃষ্ণ, আমরা তোমার কথা ও তার উত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় যাচ্ছি। তুমি নিরাপদে অগ্রসর হও। আমরা সভায় আবার তোমাকে দেখব।"

সূর্যাস্তকালে আকাশ রক্তবর্ণ হলে কৃষ্ণ বৃকস্থল গ্রামে পৌঁছালেন। তাঁর রাত্রিবাসের জন্য সেখানে শিবির স্থাপন ও খাওয়ার ব্যবস্থা করল। কৃষ্ণ স্থানীয় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন।

শিবলীলা

[দুই]

ভীমবতী গ্রামে সোময়াজী নামে এক শিবভক্ত ছিল। তার ছেলের নাম ছিল সিদ্ধরাম। সিদ্ধরামের বয়স যখন সাত বছর তখন তার বাবা মারা যায়। মা-ই কোলে পিঠে করে মানুষ করে।

দীপাবলীর কয়েক দিন আগে সিদ্ধরাম নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বনে কাঠ কুড়োতে যায়। সব বন্ধুতে মিলে গাছের নিচে বসে গল্প করতে লাগল।

"দীপাবলীর উৎসবের দিন আমরা দিদি আর জামাইবাবুকে ডেকে আনব। ঐ দিন বাড়িতে মণ্ডা মিঠাই পায়েস হবে। দিদি আর জামাইবাবুকে নতুন কাপড় দেব।" ছেলেরা এই ধরণের কথা বলাবলি করছিল। এই কথাগুলো শুনে সিদ্ধরাম বলল, "আমরাও দীপাবলীর দিন দিদি ও জামাইবাবুকে ডেকে আনব। পায়েস মণ্ডা মিঠাই বানাব। জামাইবাবুকে মিহি কাপড় দেব।"

সিদ্ধরামের কথা শুনে অন্য ছেলেরা ওর সাথে রসিকতা করে জানতে চাইল বোন-ভগ্নিপতির নাম ধাম ইত্যাদি। ওদের প্রশ্নের কোন জবাব সিদ্ধরাম দিতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এল সে।

ছেলেকে কাঁদতে দেখে তার মা তাকে কাছে ডেকে, চোখের জল মুছে জিজ্ঞেস করল, "কি হয়েছে বাবা, কাঁদছিস কেন? পড়ে গেছিস? কোথায় লেগেছে বাবা?"

বন্ধুরা যা বলেছে সিদ্ধরাম জানাল।

সব কথা শুনে তার মা বলল, "ওদের কথায় তুই কাঁদছিস কেন? তোর বোন আর

শেষ প্রচ্ছদ চিত্র

জামাইবাবুতো আছে। তোর বোনের নাম ভ্রমরাম্বা আর তোর জামাইবাবুর নাম মল্লিকার্জুন। ওরা দুজনে শ্রীশৈল পর্বতে থাকে। ওদের ঐশ্বর্যের অভাব নেই। ওদের ছেলেদের নাম গণপতি ও কুমার-স্বামী। তোর জামাইবাবুর মত মানুষ ভূ-ভারতে আর কারও জামাই হয় না।"

মার মুখ থেকে একথা শুনে সিদ্ধরাম আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলল, "তাহলে মা দীপাবলীর দিন ডেকে আনব ওদের। সবার বোন আর জামাইবাবুরা অনুষ্ঠানের দিন আসে। আমাদের বাড়িতে আসেনি।"

"বাবা, তোর বাবা মারা যাবার পর ওদের ডেকে আনার লোক আর রইল কে? তোর বয়স কম। পথে কত বন আর অরণ্য আছে। বাঘ ভাল্লুক আর সাপ ভর্তি ঐ বনে। তাছাড়া তোর জামাইবাবুরা অনেক বড়-লোক। ওরা আমাদের মত গরিবদের ঘরে আসবে কেন? আর আসলেও শুধু ওরা আসবে না। সবাইকে নিয়ে আসবে। ওদের পরিবার অনেক বড়। অত লোক এলে আমরা খাওয়াব কি? অত ক্ষমতা আমাদের কোথায়? তুই বড় হয়ে যখন রোজগার করবি তখন ডাকতে যাবি তোর বোন আর ভগ্নিপতীকে।" মা ছেলেকে বুঝিয়ে বলল।

সিদ্ধরাম তখনকার মত চুপ করে গেল। পরের দিন ভোর রাত্রে মাকে না জানিয়ে সিদ্ধরাম বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। পথে জিজ্ঞেস করতে করতে হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের ভয় না করে শেষ পর্যন্ত পৌঁছাল শ্রীশৈল পর্বতে। সেখানে অনেক তীর্থস্থান ও মন্দির ছিল। সিদ্ধরাম নিজের বোন ও ভগ্নিপতীর খোঁজ করতে লাগল। যাকে সামনে পেল তাকেই জিজ্ঞেস করল, "মল্লিকার্জুন কোথায় থাকে?" ওরা সিদ্ধ-রামকে একটি মন্দির দেখিয়ে দিল। মন্দিরের ভিতরে ঢুকে সিদ্ধরাম শুধু লিঙ্গ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

এত পথ হেঁটে সিদ্ধরাম ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। লিঙ্গের সামনে বসে বলে

উঠল, "জামাইবাবু তোমাকে আর দিদিকে দীপাবলী উৎসব উপলক্ষে নিয়ে যেতে এসেছি। বাড়িতে মাকে বলে আসিনি। পথে অনেক কষ্ট পেয়েছি। আমাদের গ্রামের প্রত্যেক ছেলের দিদি আর জামাইবাবুরা দীপাবলীতে যায়। আমার মা তোমাদের দেখার জন্য হাজার চোখে অপেক্ষা করছে। এতদিন আমরা ডাকতে আসিনি বলে রাগ করেছ নাকি? তুমি যত বড় লোকই হও না কেন আমাদের আত্মীয়তা তো বজায় আছে। আমরা গরিব তাই আমাদের বাড়ি আসতে তোমার ইচ্ছে করে না। তোমাদের দুজনকে না নিয়ে আমি বাড়ি ফিরব না।"

সিদ্ধরামের কাতর প্রার্থনায় কোন কাজ হল না। ওর ভগ্নিপতী বা দিদি কেউই তার ডাকে সাড়া দিল না।

সিদ্ধরামের দুঃখ হল। হতাশ হয়ে আত্মহত্যা করতে গেল। "দিদি আর জামাইবাবুকে নিয়ে যাব বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলাম। এতদিন পরে একা ফিরলে গাঁয়ের ছেলেদের কাছে আমার মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। ঐ অপমানের চেয়ে আমার মরে যাওয়া ঢের ভাল। আর যদি মরতেই হয় তবে যাদের নিয়ে যেতে এসেছি তাদের সামনেই মরব। তাতে ওরাই বদনামের ভাগী হবে।" এই সব

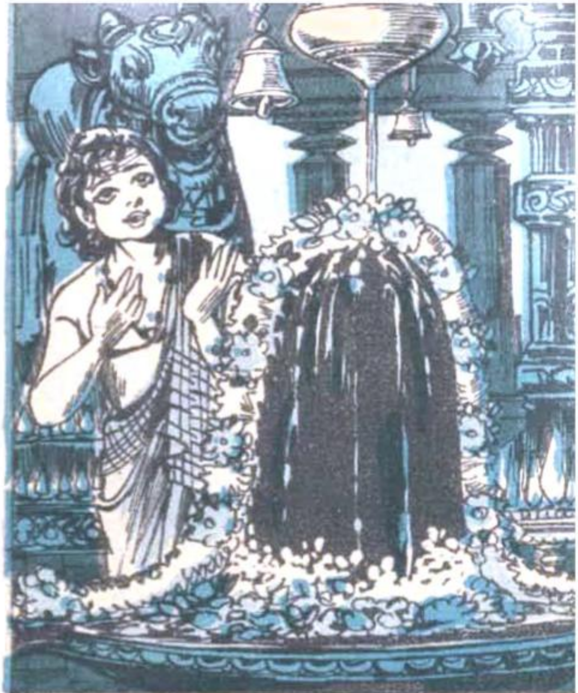

কথা ভেবে সিদ্ধরাম পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সেখান থেকে নিচে লাফ দিতে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কে যেন পেছন দিক থেকে এসে তার পিঠে হাত দিল। সিদ্ধরাম মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল একজন পুরুষ ও একজন নারী দাঁড়িয়ে আছে।

"তোমরা কারা? আমি মরতে যাচ্ছি, আমাকে বাধা দিচ্ছ কেন? আমার উপর আমার দিদির কোন টান নেই। জামাইবাবু আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না। আপনারা কেন আমাকে বাধা দিচ্ছেন?" সিদ্ধরাম তাদের বলল।

"ভাই, আমরা তোমার পর নই। আমি তোমার দিদি, ভ্রমরাম্বা। ইনি তোমার

জামাইবাবু। তুমি কোনদিন দেখনি। তাই চিনতে পারনি। কারা যেন বলছিল সোগ-য়াজীর ছেলে এখানে ঘোরাঘুরি করছে। তাই তোমার খোঁজ করতে করতে এসে গেছি।" ভ্রমরাম্বা বলল।

সিদ্ধরাম খুব খুশী হয়ে দিদি ও জামাই-বাবুকে প্রণাম করল। ওরা সিদ্ধরামকে নিজেদের ছেলেমেয়েদের দেখাল। তারপর সিদ্ধরাম তাদের তার বাড়ি যেতে নিমন্ত্রণ জানাল। তারাও যাওয়ার কথা দিল।

ওদিকে সিদ্ধরামের খোঁজ না পেয়ে তার মা পাগল হওয়ার উপক্রম হল। তার মনে হল ছেলে জেনে গেছে তার দিদি ও জামাইবাবু শ্রীশৈল পর্বতে আছে। তাই তাদের আনতে বেরিয়ে গেছে।

কিছুদিন পরে দীপাবলী উৎসবের দিনে সিদ্ধরাম বাড়ি ফিরল। মার কাছে ছুটে গিয়ে সে যে দিদি জামাইবাবুকে নিয়ে ফিরেছে তা জানাল। তাদের সাথে ওদের পরিবারের সবাই এসেছে। ওরা সবাই পাড়ার মন্দিরের কাছে অপেক্ষা করছে। সিদ্ধরামের মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে গেল ঐ মন্দিরের দিকে। সিদ্ধরামের মা সেখানে গিয়ে দেখে পার্বতী, পরমেশ্বর, গণপতি, কুমারস্বামী ও তাদের পরিবারের সবাই অপেক্ষা করছে। সিদ্ধরামের মা তাদের নিমন্ত্রণ জানাল তার বাড়িতে যেতে।

ওদের যাওয়ার পর সিদ্ধরামের বাড়ি এক বিরাট অট্টালিকায় রূপান্তরিত হল। সবাই সেই বাড়িতে ঢুকল। গ্রামের সবাই সেই বিরাট বাড়ি দেখে অবাক হয়ে গেল। বাইরের দরজা বন্ধ ছিল। কিন্তু বাইরের লোকের কাছে মনে হচ্ছিল যেন বাড়ির ভিতর অনেকে কথা বলছে।

বলা বাহুল্য দীপাবলীর দিনে সিদ্ধরামের বাড়ির অতিথি ছিলেন স্বয়ং শিব ও পার্বতী। ওঁরা সিদ্ধরাম ও তার মাকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন।

'ড্রাগন' গাছ

কেনরিস দ্বীপপুঞ্জে টেনরিফ নামে এক ছোট দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপের একটি গাছের পরিধি পঞ্চাশ ফুট। এই গাছের নাম 'ড্রাগন' গাছ। গাছটি বহু বছর বাঁচে। যে গাছের ছবি এখানে দেওয়া হল শোনা যায় তার বয়স এখন তিন হাজার বছর। এই গাছের রস লাগিয়ে বিখ্যাত মানুষের মৃতদেহ অক্ষত রাখা হয়।

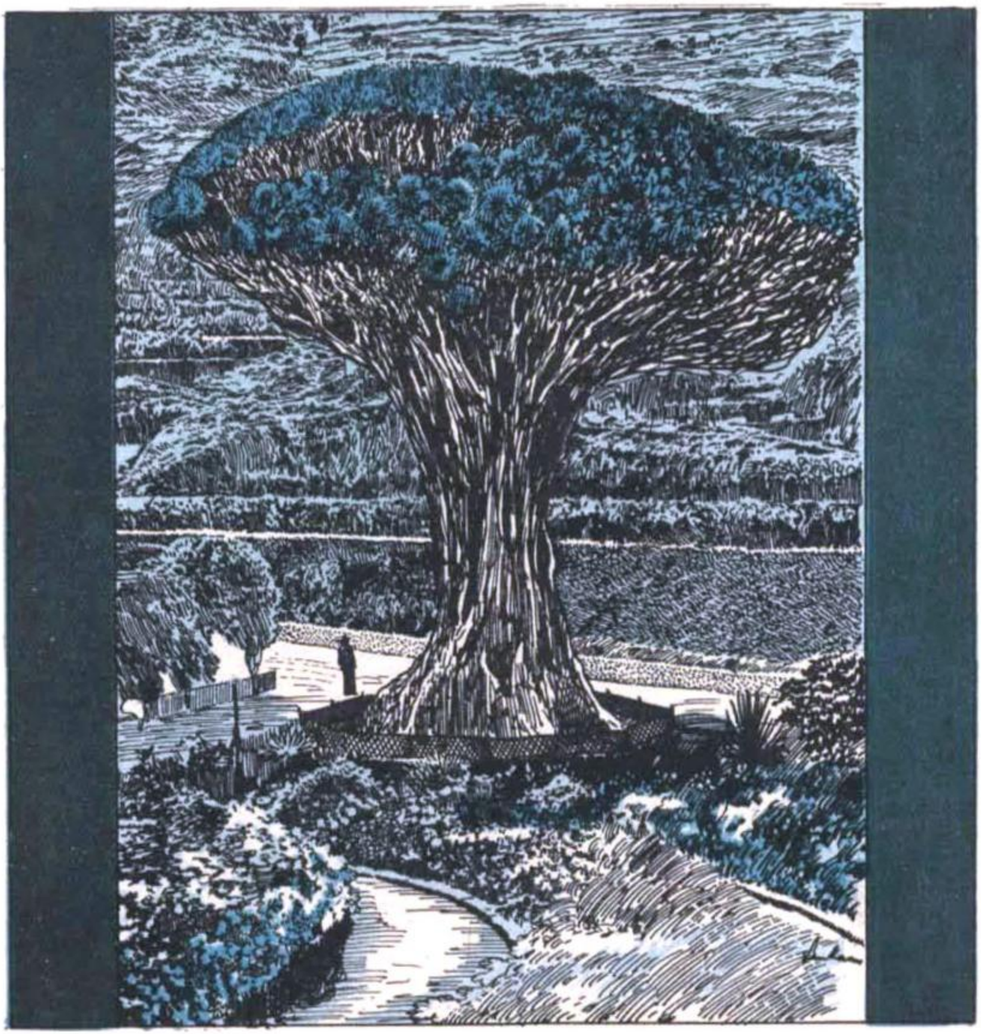

ফটো : শম্ভু মুখোপাধ্যায়

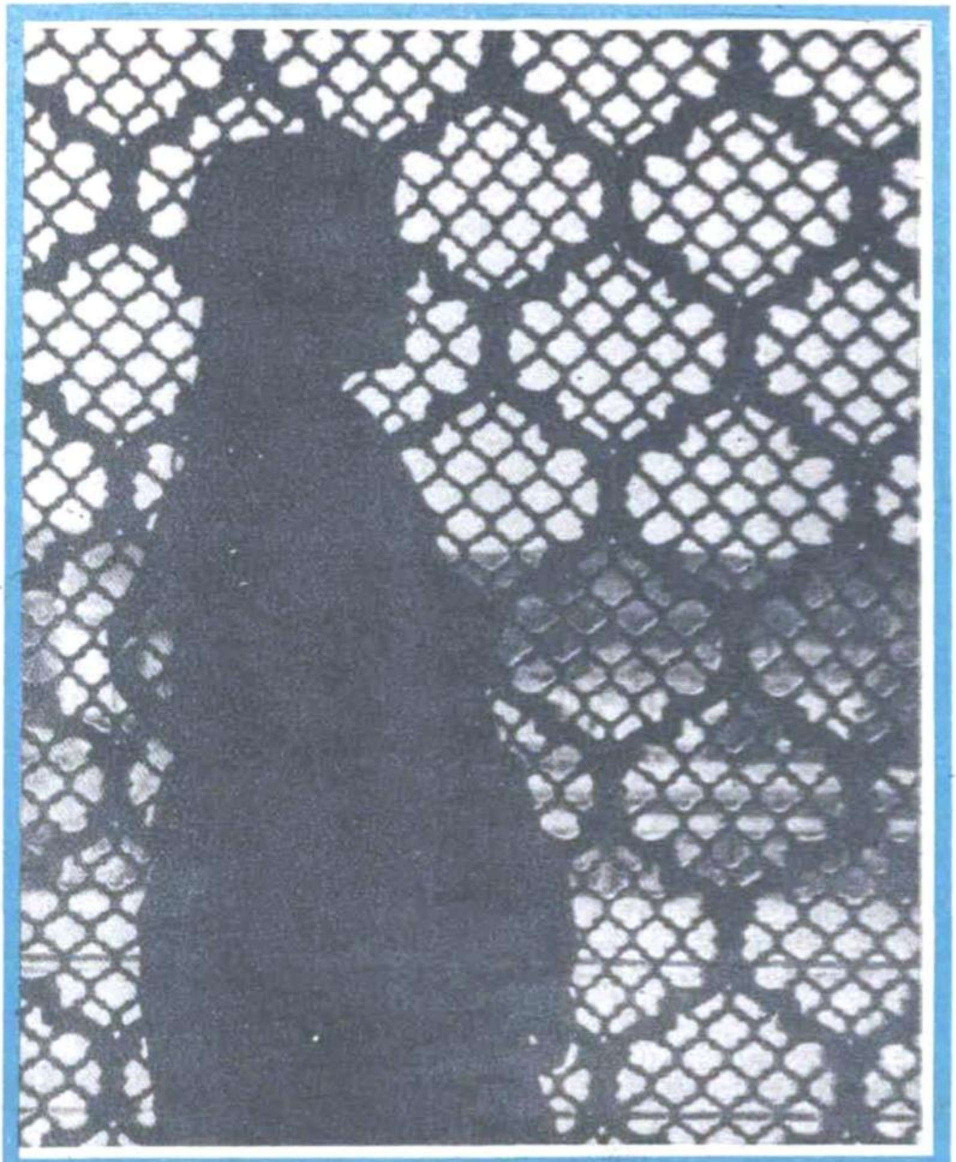

পুরস্কৃত
টাকা

ছায়া আমার কালো

পুরস্কার পেলেন
গোপাল বসু

ফটো : শম্ভু মুখোপাধ্যায়

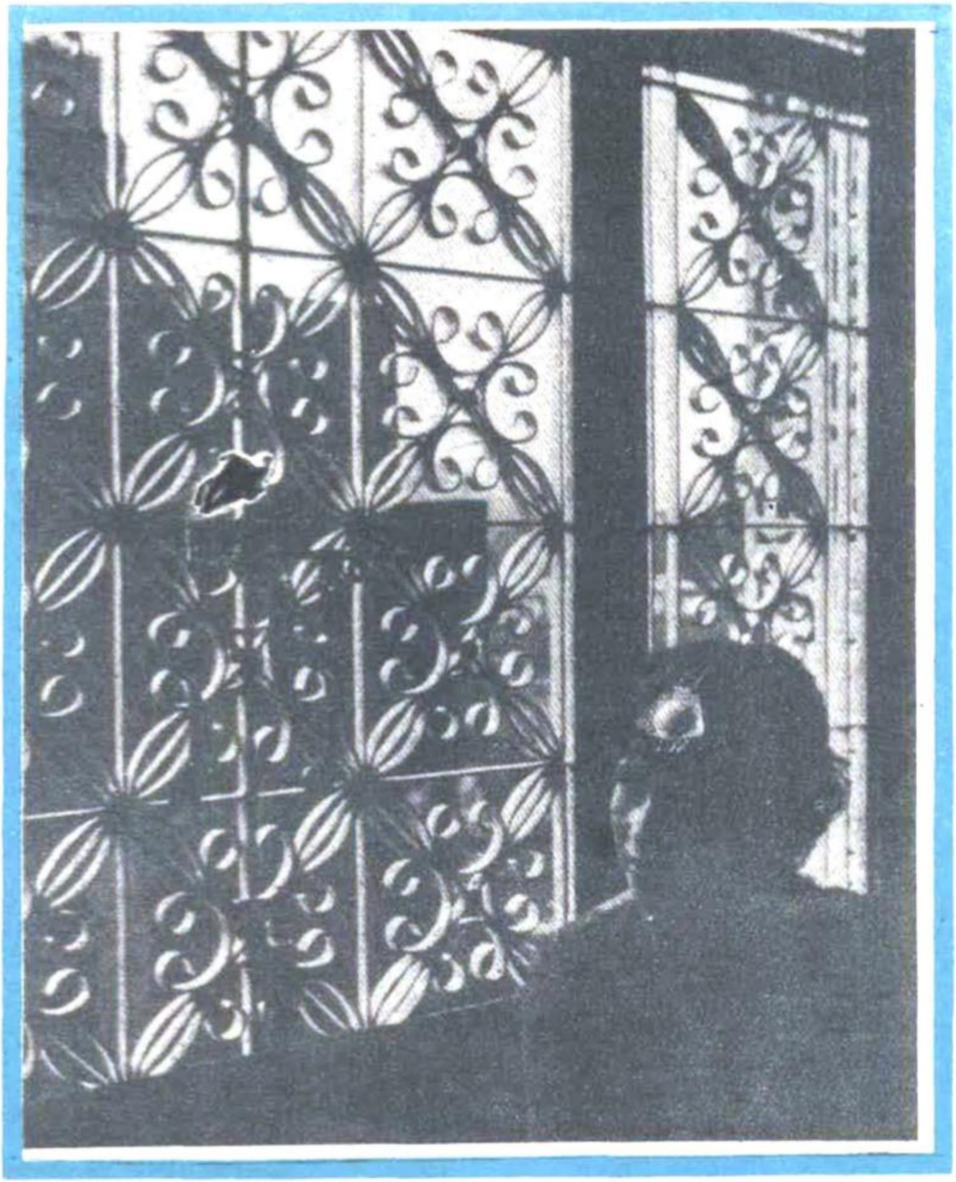

ভবানীপুর, খড়্গপুর,
মেদিনীপুর

মাথায় তোমার আলো

পুরস্কৃত
টীকা

ফটো নামকরণ প্রতিযোগিতা ঃঃ পুরস্কার ২০ টাকা

★

- ফটো-নামকরণ ২০শে এপ্রিল '৭৩-এর মধ্যে পৌঁছানো চাই।
- ফটোর নামকরণ দু চারটি শব্দের মধ্যে হওয়া চাই এবং দুটো ফটোর নামকরণের মধ্যে ছন্দগত মিল থাকা চাই। নিচের ঠিকানায় পোস্ট-কার্ডেই লিখে পাঠাতে হবে। পুরস্কৃত নাম সহ বড় ফটো জুন '৭৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

চাঁদমামা

এই সংখ্যার কয়েকটি গল্প-সম্ভার

পুরস্কার		২	কাঠের ঘোড়া	...	২৯
ধনী-গরিব		৫	কার জয়	...	৩৮
যক্ষপর্বত	...	৯	পুনর্জন্ম	...	৪২
পিতার ধর্ম	...	১৭	চঞ্চল	...	৪৫
পৈতার ভুজন		২৩	মহাভারত	...	৪৯
চুরি বিদ্যা	...	২৭	শিবলীলা	...	৫৭

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
মাদ্রাজ সেন্ট্রাল স্টেশন

তৃতীয় প্রচ্ছদ চিত্র
মাদ্রাজ রিপণ বিল্ডিং

Printed by B. V. REDDI at The Prasad Process Private Ltd., and Published by B. VISWANATHA REDDI for Chandamama Publications, 2 & 3, Arcot Road Madras-26. Controlling Editor: 'CHAKRAPANI'

FOR PRECISION IN...

Colour Printing

By Letterpress...

...Its B. N. K's., superb printing that makes all the difference. Its printing experience of over 30 years is at the back of this press superbly equipped with modern machineries and technicians of highest calibre.

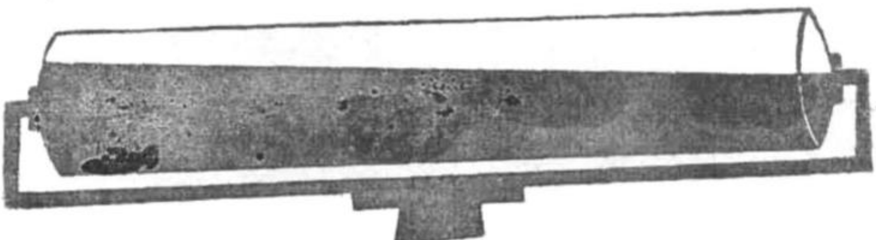

B. N. K. PRESS
PRIVATE LIMITED,
CHANDAMAMA BUILDINGS,
MADRAS-[illegible]

গ্রাহক হবার জন্য যোগাযোগ করুন ঃ ডল্টন এজেন্সীস, চাঁদমামা বিল্ডিংস, মাদ্রাজ-২৬

Photo by: **PUSHPA**

শিবলীলা